ছোটদের

শ্রেষ্ঠ বাঙালি সিরিজ

শহীদ তিতুমীর

আলমগীর হোসেন খান

ছোটদের

শ্রেষ্ঠ বাঙালি সিরিজ

শহীদ তিতুমীর

আলমগীর হোসেন খান

হাতেখড়ি

Shaheed Titumir

উৎসর্গ

২৫ ডিসেম্বর ২০০৩
বেনিনে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায়
নিহত বাংলাদেশী ১৫ জন
সেনা কর্মকর্তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে

কিছু কথা

শহীদ নিসার আলী তিতুমীর একটি নাম, একটি ইতিহাস, স্বাধীন বাংলার প্রথম স্বাপ্নিক পুরুষ। মুসলিম জাগরণের অন্যতম অগ্রদূত। তিনি বাঙালী মুসলমানদের আত্মবিস্মৃতি, অসচেতনতা, নিদ্রাচ্ছন্নতাকে জাগিয়ে তুলে তাদের জীবনে বর্ষণ এনেছিলেন। তাঁর আগমন যেন খড়ার ভেতর দিয়ে রসের অভিযাত্রা। তিনি ইংরেজ শাসক বিরোধী আন্দোলনের মহানায়ক এবং আমাদের জাতীয় চেতনার ভোরের পাখি। নিপীড়িত-শোষিত ও বঞ্চিত কৃষককুল যখন ইংরেজদের দোসর জমিদারদের জাতাকলে পৃষ্ট হয়ে মরতে বসেছিল, ঠিক তখনই তিনি বহমান স্রোতের প্রতিকূলে শক্ত অবস্থান নিয়ে আমৃত্যু টিকে থাকার স্বপ্ন দেখেন। তিনি প্রকাশ্যে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা দেন।

তিতুমীর একজন দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা পুরুষ। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনার জন্য তিনি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। ইসলাম ধর্মের প্রকৃত সংস্কার সাধনে তিনি ছিলেন এক মহান সাধক।

বাংলার স্বাধীনতার প্রথম শহীদ তিতুমীর। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি স্বাধীন জাতির। একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী স্বদেশের। তিতুমীরের স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। আমরা স্বাধীন মুক্ত বাংলাদেশ ফিরে পেয়েছি কিন্তু আজ তিতুমীরের মতো মহান দেশপ্রেমিক মানুষের বড় অভাব।

আমরা চাই আজকের ছোট ছোট কোমলমতি শিশু-কিশোররা হয়ে ওঠুক আগামী দিনের তিতুমীর।

আলমগীর হোসেন খান

ফুলকুটির
৭৮/১ আলীগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ

এক

আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। নিজেদের ইচ্ছামতো চলতে পারি। ফিরতে পারি। ভাবতে পারি। কাজ করতে পারি। কিন্তু আমাদের এই স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা,চিন্তা-ভাবনা করা ও কাজ করা এক সময়ে কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। কেননা, এদেশ ছিল পরাধীন অর্থাৎ পরের অধীন। এদেশে ইংরেজ এবং হিন্দু জমিদার, নীলকর হিন্দু রাজা মহারাজারা তাদের নিজ নিজ খেয়াল খুশি মতো শাসন করতো। সাধারণ মানুষদের উপর চালাতো নির্মম অত্যাচার-অবিচার-নির্যাতন ও শোষণ।

একদিকে ইংরেজ ও নীলকর, হিন্দু রাজা মহারাজাদের অত্যাচার অন্যদিকে ধর্মীয় গোঁড়ামীর কুপ্রভাব—এসবের যাঁতাকলে পড়ে এক সময়ে মুসলমান সমাজ বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা প্রায় ধ্বংসের পথে যেতে থাকে। ঠিক সেই দিশেহারা ও ধ্বংসোন্মুখ সময়ে মুসলমান সমাজকে জাগিয়ে তোলা ও তাদের বাঁচার পথ দেখানোর জন্যে কয়েকজন মহান পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, তাদের মধ্যে তিতুমীর একজন।

তিতুমীরের জন্মের পূর্বে এদেশ নানা প্রকার অত্যাচার-অনাচার ও অবিচারের ঘোর অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। হিন্দু, শিখ, ইংরেজ ও নীলকরদের জোর-জুলুম ও শোষণের কথা বাদ দিলেও সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মগ, ঠগ, পিনডারী, জাঠ, বর্গী প্রভৃতি দস্যুদের অকথ্য অত্যাচার নির্মমভাবে চলছিলো।

দেশ ও ধর্মকে এসব জোর-জুলুম, নিপীড়ন-নির্যাতন ও শাসন-শোষণের হাত থেকে উদ্ধার করতে উত্তর ভারতে মাথা তুলে দাঁড়ান

তিতুমীর ও পূর্ব ভারতে দাঁড়ান সৈয়দ আহমদ খান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এঁদের আরব্ধ কাজ শেষ হওয়ার আগেই মর্মান্তিকভাবে তারা শাহাদত বরণ করেন।

তবে তারা মুক্তি ও স্বাধীনতার যে প্রদীপ জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন, তা ছিল অনির্বাণ। তা কখনও নিভে যায়নি। সেই অনির্বাণ শিখাই পরবর্তী প্রজন্মকে বার বার পথ দেখিয়ে দিয়েছে স্বাধীনতার দিকে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের মূলেও ছিল স্বাধীকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন। এ আন্দোলনকে সংযত ও সংহত করে মুসলমানদের ন্যায্য দাবি আদায় করে এবং তাদের উন্নতির সঠিক পন্থা প্রদর্শন করেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান শাসক গোষ্ঠীর সাথে আপসমূলক মনোভাব নিয়ে তরবারির চেয়ে কলমের সাহায্যেই মুসলমানদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি এবং আবাসভূমি লাভের পথ এখতিয়ার করেন।

আরও কিছুকাল পরে মুসলমান সমাজ বুঝতে পারে উন্নতির পথে তাদের ধর্ম কোনো বাধার সৃষ্টি করে না। এহেন মত পোষণকারী, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিশীল কতিপয় মুসলিম যুবককে সাথে নিয়ে ঢাকায় ১৯০৬ সালে নবাব সলিমুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন 'মুসলিম লীগ'।

মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়ে মুসলিম সমাজ তাদের দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে তুলে ধরতে থাকে। বছরের পর বছর নানা প্রচার, সংগ্রাম ও আন্দোলন চালিয়ে মুসলমান সমাজ নিজেদের এক স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র হোমল্যান্ড বা আবাসভূমি অর্জিত হয়।

এরপর ৩০ বছর পাকিস্তানীরা এদেশ শাসন করে। কিন্তু তারা শাসনের নামে শোষণ-নির্যাতন ও অত্যাচার-অবিচারের স্টিমরোলার চালানোর ফলে তাদের বিরুদ্ধে এদেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর

রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও বীর সেনানীদের পর্যায়ক্রমিক আন্দোলন ও সংগ্রাম এবং পরিশেষে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীদের বিরুদ্ধে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর 'বাংলাদেশ' নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

প্রায় আড়াইশ' বছরের স্বাধীনতা আন্দোলন, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা, বহু রক্তক্ষয় ও বহু প্রাণের বিনিময়ে আজকে আমাদের এ স্বাধীনতা ও আমাদের সার্বভৌম রাষ্ট্র।

কিন্তু, আমাদের আজকের এ স্বাধীনতার সোপান রচনাকারীর গোড়ায় অনেক মহানব্যক্তির সাথে অসম সাহসীযোদ্ধা তিতুমীর নিঃসন্দেহে একজন। তিতুমীর দেশের নিপীড়িত মানুষের জন্যে কেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তিনি কেন হিন্দু জমিদার, ইংরেজ নীলকর এবং ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াকু মন নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, তিনি কেন ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে শহীদ হতে অধীর হয়ে ওঠেন, তার বিশাল পটভূমি রয়েছে।

দুই

আজ থেকে প্রায় ছয় সাত হাজার বছর আগে এ উপমহাদেশের অবস্থা ছিল বিশৃঙ্খল ও তিমিরাচ্ছন্ন। তখন যারা এ উপমহাদেশে বাস করতো তাদের কোনো শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না। তখন এখানে ছিল দ্রাবিড় গোষ্ঠী।

দ্রাবিড়রা ছিল সিনেটিক গোষ্ঠীর এক জাতি। দ্রাবিড়দের আদি বাসস্থান ছিল ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ব্যাবিলন নামক স্থানে। ব্যাবিলন থেকে এসে তারা প্রথমে বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ ও তার আশে পাশে বসবাস করতে থাকে। পরবর্তীতে তারা দেশ শাসনের উদ্দেশ্যে মহেঞ্জোদারো নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করে। তাদের এ রাজধানী হরপ্পা নামক স্থান পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। আজও তাদের ঘরবাড়ি ও স্থাপত্যের নিদর্শন মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় পাওয়া যায়।

দ্রাবিড়রা পর্যায়ক্রমে উপমহাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় দ্রাবিড়দের আগমন ঘটেছিল বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়।

দ্রাবিড়রাই প্রথম এ অঞ্চলকে 'বঙ্গ' নাম প্রদান করে বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার ময়নামতি ও উত্তর বঙ্গের মহাস্থান গড়ের ধ্বংসাবশেষ ও স্থাপত্যে দ্রাবিড়দের সভ্যতা ও কৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায়।

দ্রাবিড়দের এদেশে আসার প্রায় দুই তিন হাজার বছর পর এদেশে অর্থাৎ এ উপমহাদেশে আরেক জাতির আবির্ভাব ঘটে। এ জাতির নাম আর্যজাতি।

এই নবাগত জাতি অতিশয় হিংসুক, গোঁড়া ও কট্টরপন্থি। এরা

নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ছাড়া কিছু বোঝে না। তাই তারা প্রথমেই মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় দ্রাবিড়দের যাবতীয় নিদর্শন ধ্বংস করে দেয়। এতে দ্রাবিড়দের সাথে তাদের সংঘর্ষ বেধে যায়।

আর্য ও দ্রাবিড় দু'জাতিরই ভাষা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। আর্যদের মাতৃভাষা ছিল সংস্কৃত। এরা ছিল পৌরাণিক। এদের ধর্মপুস্তক আর্য ঋষি কর্তৃক রচিত 'পুরাণ' নামে পরিচিত। আর্য ঋষিরাই হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক বলে ধর্মীয় ইতিহাস থেকে জানা যায়। জানা যায় 'রামায়ন' ও 'মহাভারত' তাদেরই রচিত। আর্যদের আর এক ধর্মগ্রন্থ 'মনুসংহিতা'। আর্য ঋষিরা ধর্মগ্রন্থ 'মনুসংহিতার বিধানে লিখেছিলেন অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাব্র 'মগধেষুঢ়' অর্থাৎ ধর্ম ও সংস্কৃতি ব্যতীত অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গে ও মগধরাজ্যে প্রবেশ নিষেধ। আর্যদের এই ধর্মগ্রন্থে 'বঙ্গ' শব্দটি পাওয়া যায়। অর্থাৎ তখন এ অঞ্চলকে 'বঙ্গ' বলা হতো।

আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বেদান্ত দর্শনে ধর্ম প্রচারের প্রয়াসে বঙ্গে এসেছিল। পরবর্তীতে তাদের গোঁড়ামি দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। কিন্তু ঐ সময় বঙ্গ দেশে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন শুরু করে।

যিশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশ' বছর আগে গৌতম বুদ্ধের বৌদ্ধধর্ম উপমহাদেশে প্রসার লাভ করে। ঐ যুগেই এ উপমহাদেশকে 'ভারত' নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে ভারতকে 'ভারতবর্ষ' বলা হতে থাকে।

এরপর থেকে এদেশে দেশি-বিদেশী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির লোক দেশ শাসন করে, রাজত্ব করে। প্রথমে মৌর্যরা। খ্রীস্টপূর্ব চার শতকে মৌর্যবংশ এদেশে শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এই মৌর্য বংশেরই একজন রাজা ছিলেন 'অশোক' নামে। রাজা অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধে অগণিত নিরীহ লোকের প্রাণহানি ঘটে। দেশে রক্তস্রোত বয়ে যেতে দেখে রাজা অশোক আর্য ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।

এরপর আসে গুপ্ত শাসন। খ্রীস্টীয় চার অব্দে আর্যগুপ্ত শাসন কায়েম হয়। এদের রাজত্ব বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী বঙ্গদেশে রাজা শশাঙ্ক ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার ঘোর অন্ধ। সপ্তম

শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ধ্বংস করে।

খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে অরাজক যুগের অবসান ঘটিয়ে বিরাট জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে বঙ্গদেশে পাল শাসনের সূচনা হয়। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা গোপাল। রাজা গোপালের মৃত্যুর পর তার বংশধর মহীপাল, ধর্মপাল প্রমুখ পাল রাজাগণ দেশ শাসন করেন। পাল রাজত্বের সময়ই বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটতে থাকে এবং আর্যদের সংস্কৃত ভাষার পরাজয় ঘটতে থাকে।

এগারো শতক পরে সেন শাসকরা প্রায় দেড়শত বছর বঙ্গদেশ শাসন করে। সেনরা আর্য ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত সম্প্রদায়। তাই তারা বৌদ্ধ ধর্মের সকল প্রভাব মুছে ফেলার প্রয়াস চালায়। সেন রাজাদের পক্ষপাত দুষ্ট দমননীতির কারণে বৌদ্ধ ধর্ম চরম বিরূপতার শিকারে পরিণত হয়।

তিন

খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এ উপমহাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আরব দেশীয় মুসলমান নাবিকদের আগমন ঘটে। ৬৩৪ থেকে ৬৪৪ খ্রীস্টাব্দে আরব দেশ থেকে শত শত আউলিয়া দরবেশ এই উপমহাদেশে বিভিন্ন সময় ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্যে আসেন।

উপমহাদেশে মুসলিম খলিফা শাসন চলে ৭৫৫ থেকে ১০০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম উমাইয়া খলিফা ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভ্রাতুস্পুত্র মুহম্মদ বিন কাসিম উপমহাদেশের সিন্ধুর অত্যাচারী হিন্দু ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরকে যুদ্ধে পরাজিত করে সিন্ধু জয় করেন।

মুসলিম সুলতান ও পাঠানগণ এদেশ শাসন করেন ১০০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সম্রাট জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবর দিল্লীর সিংহাসন দখল করলে সুলতান ও পাঠান শাসনের অবসান ঘটে।

উপমহাদেশে মুঘল শাসন চলে ১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। মুঘলদের শেষ নামমাত্র সম্রাট বাহাদুর শাহের শাসনের পতন ঘটিয়ে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসকচক্র পূর্ণরূপে ভারতকে তাদের আয়ত্বে এনে উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায়।

১৪৯১ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগালের নাবিক ভাস্কো ডা গামা দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ভারত উপমহাদেশের ভারত সাগরের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপনীত হন বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে।

তখন থেকেই উপমহাদেশে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে পাশ্চাত্যের সাথে। পরবর্তীতে এই পথ ধরেই ইংরেজরা দলে দলে আসতে থাকে উপমহাদেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে।

পর্তুগীজরা ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে ভারতের গোয়া নামক স্থানে প্রথম কুঠি নির্মাণ করে। ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজরা গোয়া থেকে বঙ্গদেশে ঘাঁটি স্থাপন করে।

১৫১০ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট আকবর পর্তুগীজদের এদেশে বাণিজ্য করার আদেশ দান করেন। পর্তুগীজরা বঙ্গদেশের চুড়ায় তাদের প্রথম কুঠি নির্মাণ করে।

১৬০২ খ্রীস্টাব্দে হল্যান্ডের ওলন্দাজরা বাণিজ্য করার নামে বাংলার হুগলীতে পর্তুগীজদের সাথে মিলিত হয়ে 'ডাচ ইন্ডিয়া কোম্পানী' গঠন করে।

ইতিমধ্যে ইংরেজরা কলিকাতায় কুঠি নির্মাণ করেছিল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে। ইংরেজ স্যার টমাস রো সম্রাট জাহাঙ্গীরের কন্যার রোগ চিকিৎসা করে সম্রাট কর্তৃক বহু সুযোগ সুবিধা লাভ করে।

১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা বাংলার জমিদারী খরিদ করে মাত্র কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে এবং মাত্র তিন হাজার টাকা শুল্ক দিয়ে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে।

১৭৫৭ সালে ইংরেজ বণিক লর্ড ক্লাইভ বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধে পরাজিত করে পরোক্ষভাবে বাংলার স্বাধীনতা হরণ করে। তরপর ইংরেজরা মীর জাফরকে নাম মাত্র নবাব বানালেও কিছু দিনের মধ্যে তাকে এবং পরে অন্যান্য নবাবদের সরিয়ে দিয়ে নিজেরা এদেশের শাসনভার নিয়ে নেয়। এবং এদেশের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। এদেশের মানুষের ভাগ্যাকাশে নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। কোম্পানীর কর্মচারীরা দুর্নীতির চরম সীমায় পৌঁছে। কোম্পানীর হিন্দু কর্মচারীরা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা এদেশের লোকদের

এদেশীয় পণ্য স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে ব্রিটিশ পণ্য অধিক মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য করে। কোম্পানীর কর্মচারীরা ক্রমাগত বাংলায় শোষণ ও অত্যাচারের ভয়াবহ বিভীষিকা সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে বাংলার সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে মুসলমানরা দুঃখ দুর্দশার শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায়।

১৭৭০ সালে বাংলায় দেখা দেয় এক অকল্পনীয় দুর্ভিক্ষ। এতে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। কথিত আছে ইংরেজরা পাশ্চাত্যের মেথর ও কুকুর এনেছিল এদেশের মানুষের লাশ সরানোর জন্য, যেহেতু তখনকার শকুনের পক্ষেও এত লাশ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব ছিল না।

ইংরেজ লেখক উইলিয়াম হানটার তার গ্রন্থে লিখেছেন, "তখনকার বাংলার জনসংখ্যা ৩ কোটির প্রতি ১৬ জনে ৬ জন মৃত্যুবরণ করেছিল।"

ইংরেজ বণিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চ ক্ষমতাশালী কর্মকর্তা লর্ড ক্লাইভের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অভিযোগ ওঠেছিল। পার্লামেন্টোরী তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত লর্ড ক্লাইভ ও কর্মচারীরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা থেকে যে পরিমাণ ঘুষ গ্রহণ করেছিল তা ছিল তখনকার দিনে ৯ কোটি টাকা।

খ্রিস্টীয় ৭০৫ সাল থেকে ১৭৪৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ এক হাজার বছরের বেশী সময়ব্যাপী মুসলমান উমাইয়া খলিফা, সুলতান, পাঠান ও মুসলমানগণ উপমহাদেশে রাজত্ব করেছেন। মুসলিম শাসনামলে ইউরোপ মহাদেশের পর্তুগীজ, ওলন্দাজ এবং ইংরেজরা সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে এ উপমহাদেশে আগমন করে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। কথিত আছে ইউরোপবাসীরা উপমহাদেশে আগমনের পর দেশের সরল সহজ মানুষদের সাথে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করে তাদের ধন সম্পদ লুট করে, লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ইউরোপে তাদের নিজ নিজ রাজ্য উন্নয়নে ব্যয় করে।

বাংলায় ইংরেজ বণিক লর্ড ক্লাইভ প্রকারান্তরে ইংরেজ শাসন কায়েমের পর উপমহাদেশ দখলের প্রয়াসে অগ্রসর হতে থাকে এবং উপমহাদেশের অধিকাংশ স্থান তাদের করায়ত্ব করে নেয়।

১৮৫৮ সালে দিল্লীর শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের কাছ থেকে

সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইংরেজরা সমগ্র উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

ইংরেজরা ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর মাটিতে পরাধীনতার যে বীজ বপন করেছিল একশ' বছর পর তা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চ ক্ষমতাশালী লর্ড ক্লাইভ ও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড মেকলে তার Essay on Lord Clive গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বা সরকারের স্বার্থে নয় বরং কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্বার্থেই তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিল।'

দিল্লীর সিংহাসন দখল করার পর ইংরেজ শাসকরা ভারতবর্ষের মুঘল স্থাপত্য 'তাজমহল' ও 'ময়ূর সিংহাসনের' মতো বহু মূল্যবান 'কোহিনূর হীরা' ও 'মনিমুক্তা' লুট করে নিয়ে বাকিংহাম প্রাসাদের শোভাবর্ধন করে।

ইংরেজ শাসকরা ভারতবর্ষের অমুসলিম হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভৃতি গোষ্ঠীকে হাতের মুঠোয় রেখে মুসলমানদের সকল ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করে। ওদিকে অমুসলিম গোষ্ঠীকে শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, সরকারী চাকরিতে এগিয়ে নিয়ে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এদেশের মুসলমানদের দাস বা গোলামে পরিণত করে। ইংরেজ লেখক উইলিয়াম হানটারের লেখা 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থটিই এর স্বাক্ষর বহন করে।

একদিকে ইংরেজ শাসকদের দুর্নীতি ও দমননীতি, অপরদিকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের হিংসা, বিদ্বেষ ও ঈর্ষার নীতির ফলশ্রুতিতে সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানেরা শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থে-সামর্থে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে যায়। মুসলিমদের পদানত করতে এদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাদানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথমেই বাধার সৃষ্টি করে।

মুসলমানদের বহু মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়। বহু মাদ্রাসা শিক্ষককে হত্যা করা হয়। ইংরেজদের প্রথম লক্ষ্যই ছিল ভবিষ্যতে তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম আগ্রাসন চিরতরে নির্বাপিত করা। খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যৌথভাবে এদেশে মুসলিম নিধন শুরু করে। উপমহাদেশে ইসলামধর্মকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে।

চার

সব অত্যাচার-অন্যায়ের বিরুদ্ধে ১৭৭০ সালে শুরু হয়েছিল বাংলায় ফকির মজনু শাহের ফকিরী আন্দোলন। কিন্তু ইংরেজরা অত্যাচার ও অবিচারের স্টীমরোলার চালিয়ে ফকির বিদ্রোহ দমন করে।

ইংরেজ শাসন ক্রমে এদেশের সমাজ ও মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে থাকে। ইংরেজদের শোষণ ও পীড়নের কারণে ধীরে ধীরে এদেশের মানুষ অধিকার সচেতন হয়ে ওঠতে থাকে, তারা জেগে ওঠতে থাকে। আর এভাবেই নানা আন্দোলন ও সংগ্রাম শুরু হয়। সাথে সাথে এদেশের কতিপয় শিক্ষিত সচেতন মানুষ বুঝতে পারেন সমাজ জীবনে প্রচলিত নানা দূর্বলতা সংস্কারের মধ্য দিয়ে দূর করতে হবে এবং মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাহলেই সম্ভব হবে সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলা।

পলাশীর যুদ্ধে বাংলায় রাজনৈতিক ও সামাজিক নানাবিধ পরিবর্তন আসে। দেশবাসী এসব পরিবর্তন একেবারে নিরবে মেনে নেয়নি। রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ উদাসীনও ছিল না। অবশ্য তখনও জাতীয়তাবাদী চেতনা দেখা দেয়নি।

অর্থাৎ বাংলার সকল ধর্ম ও মতের মানুষ যে এক জাতি এবং একই দেশের অধিবাসী এমন ঐক্যবদ্ধ চিন্তা তাদের হয়নি। ব্রিটিশ এবং ব্রিটিশদের দোসর জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে যেসব আন্দোলন সংঘটিত হয় সেগুলোর মধ্যে ফকির আন্দোলন, তিতুমীরের সংগ্রাম, ফরায়েজী আন্দোলন ও নীল বিদ্রোহ প্রধান।

আধুনিক শিক্ষার পূর্বে মুসলমান সমাজে জনগণের নেতা ছিলেন পীর, ফকির ও আলেমগণ। মুঘল আমলে তাদেরকে নিষ্কর ভূমি দান করা হতো। তারা অবাধে ধর্মীয় কার্যকলাপ চালাতে পারতো। তাই তারা শান্ত ছিল।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এ নীতির পরিবর্তন করে। ফকিরদের নিষ্করভূমি দান প্রথা বাতিল করে দেয়। এতে ফকিররা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই ফকিরগণ বেশ কিছু ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত করে। ১৭৮০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে এসকল আন্দোলন সংঘটিত হয়।

সে আমলে ফকিরগণ বিভিন্ন সংঘে বিভক্ত ছিল। একটি সংঘের সকল সদস্য এক সাথে এক তীর্থ থেকে অপর তীর্থে ঘুরে বেড়াতো। তারা সংসারী জীবন যাপন করতো না। মুষ্ঠি ভিক্ষা সংগ্রহ করে তারা জীবন ধারণ করতো। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তারা হালকা ধরনের অস্ত্র-সস্ত্র সাথে রাখতো।

ব্রিটিশ সরকার ফকিরদের অবাধ চলাচলে বাধা দেয়। তাদের মুষ্ঠি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণা করে। তাদের অস্ত্র বহনকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। এভাবে ফকিরদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন ফকির মজনু শাহ।

ফকিরদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল অবাধে মুষ্ঠি ভিক্ষা সংগ্রহের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা। তারা জাতীয়তাবোধে তেমন উদ্বুদ্ধ ছিল না।

ফকিরগণ বাকেরগঞ্জ, ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজদের বিভিন্ন কুঠি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। তবে উত্তরবঙ্গ ছিল তাদের আন্দোলনের মূল কেন্দ্র।

ফকিরদের দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সৈন্য পাঠায়। কিন্তু ফকিরদের যুদ্ধের কৌশল ছিল অতর্কিত আক্রমণ ও পলায়ন। মজনু শাহকে ব্রিটিশরা পরাজিত করতে পারে না।

১৭৮৭ সালে ফকির মজনু শাহের মৃত্যু হয়। এরপর ফকিরদের নেতৃত্ব দেন মুসা শাহ, চেরাগ আলী শাহ, সোবহান শাহ, মাদার বকস ও করিম শাহ প্রমুখ ফকিরগণ।

১৮০০ সালের মধ্যে ফকিরগণকে চূড়ান্তভাবে দমন করা হয়।

১৮২০ সালে ভারতে ওহাবী আন্দোলনের প্রবল জোয়ার প্রবাহিত হয়েছিল মুসলমানদের ঘরে ঘরে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতের সংগ্রামী দুঃসাহসিক সৈনিক গাজী আহমদ। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে তখনকার সমগ্র ভারতের আট কোটি মুসলমান খুঁজে পেয়েছিল মুক্তিপথ।

মুসলমানদের ঘুম ভেঙ্গে গেলো আজাদীর আহবানে। ইসলামের পতাকা হাতে এগিয়ে চললো মুজাহিদ দল। এ আন্দোলনের আর এক বীর সেনানী বাংলার তিতুমীর। এক অসম সাহসী যোদ্ধা। এক মুক্তিপাগল মানুষ। যিনি নিজে যেমন মুক্ত স্বাধীনচেতা, তেমনি তিনি মুসলমান জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যে জীবন মরণ পণ করেন।

পাঁচ

শত শত বছরের অত্যাচার-অবিচার, নিপীড়ন-নির্যাতন, অবহেলা অবজ্ঞা, কুসংস্কারের বোঝা বাংলার মাটিকে উত্তপ্ত করে তোলে।

এই বাংলা সবুজ শ্যামল। নদী-নালা, খাল-বিলে ভরপুর। এখানে যেমন গাছপালার শীতল ছায়া তেমনি এখানে প্রচুর উন্মুক্ত প্রান্তর।

সবুজ-শ্যামল, ছায়াঘেরা, পাখি ডাকা গ্রামবাংলা এদেশের মানুষের মনকে শান্ত করে রাখে। আর এর উদার প্রান্তর এদেশের মানুষকে উদার হৃদয়ের হতে শিক্ষা দেয়।

বাংলার অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল এদেশের মানুষকে করে তোলে সংস্কৃতিমনা।

বাংলার মানুষ তাই প্রকৃতিগত ভাবে হয়ে ওঠে শান্তমনের ও উদার হৃদয়ের। প্রকৃতির শিক্ষা পেয়ে তারা হয় সহজ সরল হৃদয়বান।

কিন্তু যুগে যুগে এদেশে আসে বিদেশী, ভিন্নভাষা ও ভিন্ন সংস্কৃতির লোক। তারা এই সরল সহজ মানুষদের পদে পদে ঠকাতে থাকে। তাদের সাথে প্রতারণা করতে থাকে। কারণে অকারণে তাদের ওপর নির্যাতন চালায়।

এই বাংলা ছিল সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। এখানে প্রচুর ধান-পাট ফলতো। প্রচুর তরিতরকারী হতো। প্রচুর মাছ-মাংস এখানে পাওয়া যেতো। এদেশের মানুষের ছিল অনন্ত সুখ, অনন্ত শান্তি ও ভালবাসা।

অনন্ত সুখ ছিল বলে তাদের কণ্ঠে ছিল গান। তাদের হাতে ছিল কলম- সেই কলম দিয়ে তারা কবিতা রচনা করতো। গল্প লিখতো।

উপন্যাস লিখতো। তারা গানে-লেখায় তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতো।

অভাব-অনটন, দুঃখ-দারিদ্র, রোগ-ব্যাধি তাদের ছিল না। এসব কি তা তারা জানতো না। সারাটা দিন, সারাটি মাস, সারাটি বছর তাদের কাটতো আনন্দ কোলাহলের মধ্যে।

তাই তারা বারো মাসে তেরো পার্বনে মেতে ওঠতো। শীতের মওসুমে হরেক রকমের পিঠা তৈরীর হিড়িক পড়ে যায়। বাড়ির ছেলে-মেয়ে, যুবক-প্রৌঢ় সবাই সে পিঠা খায়। জামাই-মেয়ে, অথবা দূরে থাকা আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দিয়ে আনা হয় পিঠা খাওয়ার জন্যে। মহা ধুমধামে সেই পিঠা পার্বণ বাংলার মানুষ উপভোগ করে।

ফলের দিনে আম-জাম-কাঁঠাল-তরমুজ-বাংগী কলা- আনারস-আতা ফল- পেয়ারা ইত্যাদিতে পুরো দেশটা অপূর্ব ঘ্রাণে ম ম করতে থাকে। তখন শুরু হয় ফল-ফলাদি খাওয়ার উৎসব। মেয়ে-মেয়ের জামাই, দূরে অবস্থানরত ছেলে-মেয়ে বা আত্মীয়-স্বজনকে খবর দেওয়া হয় ফল খাওয়ার জন্যে। প্রবাদ হয়ে যায় 'আম-দুধ' মজাদার খাবার। আম দুধ এমনই মজাদার ও স্বাদের খাবার যে, এই বাংলা ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও আম-দুধ পাওয়া যায় না।

খেতে নতুন ফসল ওঠলে শুরু হয়ে যায় 'নবান্নের' উৎসব। নতুন ফসল ওঠা মাত্র আবার শুরু হয় এই নতুন ফসল দিয়ে খাওয়া দাওয়া।

কিন্তু একাকী কি তো আর আনন্দ হয় না। আনন্দের জন্যে চাই একাধিক জন, বহুজন। তাই দাওয়াত দেয়া হয় আত্মীয়-স্বজন এবং গ্রামবাসীকে-এসো তোমরা, নতুন ফসলের খাদ্য আমরা সবাই গ্রহণ করি এবং আনন্দ করি।

এই বাংলায় ছিল গোলা ভরা ধান আর গোয়াল ভরা গরু। পুকুর-নদী ভরা মাছ।

সব খাদ্য ছিল বিশুদ্ধ। বায়ু ছিল বিশুদ্ধ। মানুষের মনে ছিল না কোনো লোভ-লালসা। তাই তাদের ছিল না কোনো টেনশন। ফলে রোগ-ব্যাধি তাদের ছিল না।

মুসলমান পালন করতো ইসলাম ধর্ম। হিন্দুরা হিন্দু ধর্ম। বৌদ্ধরা

বৌদ্ধ ধর্ম।

মুসলমানদের ছিল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার উৎসব। ছিল শবেবরাতের উৎসব।

হিন্দুদের ছিল দূর্গাপূজা ও স্বরস্বতী পূজা এবং আরো অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

বৌদ্ধদের ছিল মাঘী পূর্ণিমা ও অন্যান্য ধর্মোৎসব।

এই সুখকর অবস্থা নবাব আলীবর্দী খাঁ পর্যন্ত ছিল।

নবাব আলীবর্দী খাঁ ছিল বাংলা, বিহার উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব। তার সময়েই ইংরেজ বেনিয়ারা আসে এদেশে বাণিজ্য করতে। এদেশের সম্পদ দেখে ইংরেজদের লোভ হয়। এদেশের মানুষের সুখ-শান্তি দেখে ইংরেজদের হিংসা হয়। ইংরেজরা এদেশের মানুষের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করা ও এদেশের সম্পদ গ্রাস করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়।

ইংরেজরা আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পূর্বেই এদেশকে কবজা করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তার মৃত্যুর পর তারা তাদের ষড়যন্ত্রে কৃতকার্য হয়।

নতুন ও তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তার প্রধান সেনাপতি মীরজাফর ও তার অমাত্য জগতশেঠ, উমিচাঁদ ও রায়দুর্লভকে প্ররোচিত করে তোলে।

মীরজাফরকে তারা টোপ দেয় তাকে বাংলার নবাব করা হবে। জগতশেঠ, উঁমিচাদ ও রায়দুর্লভকে প্রচুর ধনসম্পদ দেয়া হবে।

এরা ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের সাথে একাত্ম ঘোষণা করে এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করা এবং মেরে ফেলতে তারা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

অতঃপর ১৭৫৭ সালের ৩০শে জুন মুর্শিদাবাদের অদূরে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি মীরজাফর তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে নবাবের বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলে যুদ্ধে নবাববাহিনী ইংরেজদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা রাজধানী মুর্শিদাবাদে যাওয়ার পথে ধরা

পড়েন। তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

কারাগারে মীরজাফরের পুত্র মিরণের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ নবাব সিরাজকে ছুরিকাঘাতে মেরে ফেলে।

বলাবাহুল্য, নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সুখ-শান্তি ও স্বাধীনতার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইংরেজরা সেনাপতি মীরজাফরকে নবাব ঠিকই বানায় তবে সে নবাব হয় ইংরেজদের হাতের পুতুল। শুধু তাই নয় মসনদে বসার লোভে মীরজাফরকে রাজকোষের সকল ধনসম্পদ ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে হয়। ফলে রাজকোষ হয়ে পড়ে শূন্য।

ইংরেজরা মীরজাফরকে মসনদে বসিয়ে অধিক ধনদৌলত ও অর্থ লাভের আশায় বাংলার মানুষদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন শুরু করে। সেই শুরু হয় নির্যাতন, নিপীড়ন ও অত্যাচার।

ক্রমে ইংরেজরা এদেশের মানুষকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে নিজেরাই শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়। এবং তাদের ইচ্ছামতো দেশ শাসন করতে থাকে। ইংরেজদের শাসন প্রকৃত শাসন ছিল না। ছিল শোষণ।

তারা সবদিক দিয়ে বাংলার মানুষকে অত্যাচার-নির্যাতন ও শোষণ করতে থাকে।

বাংলার মানুষের সংস্কৃতি-কৃষ্টি-দর্শন-শিক্ষা সব কিছুকে বিনষ্ট করতে থাকে। এমনকি তাদের ধর্মের ওপরও তারা আঘাত হানে। মাদ্রাসা শিক্ষা, মক্তবে শিক্ষা তারা একরূপ উঠিয়েই দেয়। সেখানে তারা তাদের সংস্কৃতি-কৃষ্টি-দর্শন ইত্যাদি ঢুকাতে থাকে।

ছয়

মুসলমান জাতি ধর্মগতভাবে এই শিক্ষাই পেয়েছে যে, তারা একমাত্র মহান আল্লাতায়ালার কাছে মাথা নত করবে, আর কারো কাছে নয়। সে ইংরেজ শাসক হোক আর যেই-ই হোক। এই ধর্মীয় বোধ বা আদর্শের কারণে মুসলমানদের ইংরেজরা দু'চোখে দেখতে পারে না।

অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায় নতজানু স্বভাবের। তাই ইংরেজদের দেয়া লোভ-লালসায় তারা সামিল হয়। ফলে অফিস আদালতে, স্কুল-কলেজে তারা ইংরেজদের দেয়া সুবিধা পেতে থাকে। এক পর্যায়ে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে সুযোগও তারা পেয়ে যায়। ফলে হিন্দুদের মধ্যে থেকে জমিদার হয়ে পড়ে। ইংরেজরা হিন্দু জমিদারদের দিয়ে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালায়।

এরফলে কালে কালে মুসলমানরা ইংরেজ, হিন্দু জমিদার, ইংরেজ নীলকর ও হিন্দু মহাজনদের রোষানলে পড়ে নির্যাতীত জীবন যাপন করতে থাকে।

মুসলমানদের স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকে না। তারা অফিস-আদালতে স্থান পায় না। স্কুল-কলেজে স্থান পায় না। ইংরেজ সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি করলো যে, হিন্দুদের কাছে মুসলমানরা হয়ে ওঠলো অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন। মুসলমানরা কোনো কিছু স্পর্শ করলে তা হিন্দুদের কাছে অপবিত্র হয়ে যেতো। হিন্দু বাড়ীতে মুসলমানদের প্রবেশ নিষেধ হয়ে গেলো।

কতিপয় হিন্দু লেখক মুসলমানদের বিরুদ্ধে গল্প, উপন্যাস লিখে

হিন্দুদের উত্যক্ত করে তুললো। হিন্দু লেখকরা মুসলমানদের অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন বলে আখ্যায়িত করলো।

শুধু তাই নয়, হিন্দু জমিদাররা ঈদুল আযহায় মুসলমানদের গরু কোরবানী দেয়া নিষিদ্ধ করে দেয়।

“আরেকটা ব্যাপার আমাকে খুবই পীড়া দিত। জমিদাররা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সব প্রজার থনেই কালীপূজার মাথট আদায় করিতেন। এটা খাজনার সাথে আদায় হইত। খাজনার মতই বাধ্যতামূলক ছিল। না দিলে খাজনা নেওয়া হইত না। ফরাজী পরিবারের ছেলে হিসাবে আমি গোঁড়া মুসলমান ছিলাম। মূর্তিপূজার চাঁদা দেওয়া শেরেকী গোনা। এটা মুরুব্বিদের কাছেই শেখা মছলা। কিন্তু মুরুব্বিরা নিজেরাই সেই শেরেকী গোনা করেন কেন? এ প্রশ্নের জবাবে দাদাজী, বাপজী ও চাচাজী তারা বলিতেন ঃ না দিয়া উপায় নাই। এটা রাজার জুলুম। রাজার জুলুম নীরবে সহ্য করা এবং গোপনে আল্লার কাছে মাফ চাওয়া ছাড়া উপায় নাই। এ ব্যাপারে মুরুব্বিরা হাদিস কোরআনের বরাত দিতেন। কিন্তু আমার মন মানিত না। শিশুসুলভ বেপরোয়া সাহস দেখাইয়া হাম্বি তাম্বি করিতাম। মুরুব্বিরা ‘চুপচুপ’ করিয়া ডাইনে বাঁয়ে নজর ফিরাইতেন। জমিদারের লোকেরা শুনিয়া ফেলিল নাতো।”

আরেকটি –

“কালীপূজা উপলক্ষ্যে জমিদার কাছারিতে বিপুল ধুমধাম হইত। দেশ বিখ্যাত যাত্রাপার্টিরা সাতদিন ধরিয়া যাত্রাগান শুনাইয়া দেশ মাথায় করিয়া রাখিত। হাজার হাজার ছেলে-বুড়া সারারাত জাগিয়া সে গান বাজনা-অভিনয় দেখিত। সারা দিন মাঠে ময়দানে খেতে-খামারে এইসব নাটকের ভীম-অর্জুনের বাখানি হইত। দর্শক শ্রোতারা প্রায় সবাই মুসলমান। কারণ এ অঞ্চলটাই মুসলমান প্রধান। আমাদের পাড়া-পড়শী আত্মীয়-স্বজন সবাই সে তামাশায় শামিল হইতেন। শুধু আমাদের বাড়ির কেউ আসিতেন না। আমাদের শিশুমন ঐসব তামাশা দেখিতে উস্‌খুস্‌ করিত নিশ্চয়। পাঠশালার বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া চলিয়াও যাইতাম তার কোন কোনটায়। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতাম না। বয়স্ক কারও সঙ্গে দেখা হইলেই

তারা বলিয়া উঠিতেন ঃ "আরে, তুমি এখানে? তুমি যে ফরাযী বাড়ির লোক। তোমার এসব দেখতে নাই।" শেষ পর্যন্ত আমি ঐসব তামাশায় যাওয়া বন্ধ করিলাম। কিন্তু বোধ হয় কারো নিষেধে ততটা নয় যতটা শিশু মনের অপমান বোধে। কারণ সেসব যাত্রা-থিয়েটারের মজলিসেও সেই কাছারীর ব্যবস্থা। 'ভদ্রলোকদের' বসিবার ব্যবস্থা। মুসলমানদের ব্যবস্থা দাঁড়াইয়া দেখার।" [আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর-আবুল মনসুর আহমদ]

ওয়াক্তিয়া ও জুমার নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদ বা জুমা ঘর নির্মাণ করতে গেলে বাধা দেয়। মুসলমানী নাম রাখা নিষিদ্ধ হয়। মাথায় টুপি পরা কিংবা দাঁড়ি রাখা নিষেধ হয়ে যায়। যদি কেউ এসব অমান্য করে তাহলে তাকে অতিরিক্ত কর তো দিতেই হবে উপরন্তু শাস্তি ভোগ করতে হয়।

কালে কালে কোনো কোনো মুসলমানরা বেঁচে থাকার জন্যে এবং তাদের ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি বজায় রাখার জন্য ইংরেজ, হিন্দু জমিদার, ইংরেজ নীলকর ও হিন্দু মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। সংগ্রাম করে তাদের বেঁচে থাকতে হয়েছে।

বাংলায় যে সুখ-শান্তি ছিল তা তো ধ্বংস হয়েই যায় উপরন্তু মুসলমান সমাজকে সর্বদা লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। জীবন যাপন করতে হয়।

মুসলমানদের পুনর্জাগরণের সর্বপ্রথম দাওয়াত আসে স্যার সৈয়দ আহমদের কাছ থেকে। সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের ওপর নানাবিধ অত্যাচার-নির্যাতন-শোষণ ও তাদের ধর্মের ওপর বিধর্মীদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

সৈয়দ আহমদের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে বাংলায় আসেন হাজী শরীয়তুল্লা পূর্ববঙ্গে। এবং সৈয়দ আহমদের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে আসেন তিতুমীর উত্তরবঙ্গে।

সাত

অবশ্য তিতুমীর উত্তরবঙ্গের চব্বিশ পরগনায় জন্ম গ্রহণ করার পর থেকে যে পরিবেশ দেখেছেন, তাতে তার মন এক রকম বিদ্রোহী হয়েছিল। কিন্তু তার দল ছিল না বলে, বিদ্রোহ করার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না বলে এবং তিনি তখনও সম্পূর্ণ তৈয়ার হয়ে উঠেছিলেন না বলে বিদ্রোহ করতে পারেননি।

জন্মের পর থেকেই তিতুমীর দেখতে পান হিন্দু জমিদারদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি। তার জন্মস্থান নারকেলবাড়িয়ায়, চাঁদপুরে ও গোবর ডাঙ্গায় অর্থাৎ চব্বিশ পরগণাব্যাপী হিন্দু জমিদাররা দাপটের সাথে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো প্রজা সাধারণের ওপর নির্যাতন-নিষ্পেষণ ও শোষণ চালাচ্ছে।

শৈশব থেকেই তিতুমীর দেখেছেন—হিন্দু জমিদাররা যখন যা খুশি তাই করছে। জমিদারদের হুকুমে তাদের পাইক বরকন্দাজরা নিরীহ মানুষদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

আর নির্যাতনের শিকার মুসলমান জাতি। তিতুমীর দেখেছেন —তার চোখের সামনে মুসলমানের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আর সেই লেলিহান শিখা আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে পরিবারের লোকজন অসহায়ের মত হাউ মাউ করে কাঁদছে।

তিতুমীর দেখেছেন—তার চোখের সামনে মুসলমান চাষীদের নির্মমভাবে চাবুক মারা হচ্ছে। চাবুকের আঘাতে বুক পিঠ চিরে দরদর করে রক্ত ঝরছে। পাশে সেই চাষীর আপনজনকে পেয়াদারা ধরে রেখেছে-সে

চিৎকার করে কাঁদছে। কেউ ফেরানোর নেই। কেউ প্রতিবাদ করার নেই।

জমিদারের পাইক বরকন্দাজ পেয়াদাদের দাপটের সামনে, শক্তির সামনে, মাথা উঁচু করে কথা বলার কেউ নেই। সবাই সর্বদা ভয়ে তটস্থ। প্রতিবাদ করার ভাষা যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে। রুখে দাঁড়াবার শক্তি সাহস যেন তারা আর পাচ্ছে না।

তিতুমীর দেখেছেন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী তাদের সুশিক্ষিত সেনাদল নিয়ে, দর্পের সাথে যায়। তারা হিন্দু জমিদার বাড়ীতে আতিথিয়তা গ্রহণ করে। রাতভর সেখানে মদের আড্ডা বসে। হৈ হুল্লোড় ও আনন্দ ফূর্তিতে রাত কাটায়।

তাদের আনন্দ ফূর্তির টাকা যোগাতে হিন্দু জমিদাররা মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর চড়াও হয়। জোর জবরদস্তি করে অর্থ করি আদায় করে। নগদ অর্থ না পেলে গরু-ছাগল কেড়ে নেয়, সেগুলো না পেলে ধানচাল কিংবা জামা-কাপড়ও ছিনিয়ে নিয়ে আসে।

যদি কোনো স্থানে জমিদারের লোকেরা বাধাপ্রাপ্ত হয় সেখানে ইংরেজ সেনারা যায় এবং অকথ্য নির্যাতনের বন্যা বইয়ে দেয়।

এইসব দেখেশুনে তিতুমীরের মানসিকতা শৈশব থেকেই প্রতিবাদী হয়ে ওঠতে থাকে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন-এইসব অন্যায়-অবিচার-নির্যাতন-নিষ্পেষণ ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন তিনি।

তাই তিনি শৈশব থেকেই কুস্তি শেখেন, ডন করেন, লাঠিখেলা শিখতে থাকেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দেহে শক্তি সঞ্চয় না করলে এসবের প্রতিবাদ করা সম্ভব হবে না। নিজের দেহে শক্তি সঞ্চয় এবং সংগঠন অতীব জরুরী বিষয়।

অর্থাৎ তিতুমীর শৈশব থেকেই নিজেকে তৈরি করে তুলতে থাকেন। তিনি লেখাপড়া করেন, শরীরচর্চা করেন, যুদ্ধের নানাবিধ কৌশল আয়ত্বে আনার চেষ্টায়রত থাকেন।

আট

তিতুমীর কিন্তু তার আসল নাম নয়। তিতুমীরের আসল নাম হচ্ছে সৈয়দ নিসার আলী। তার বাবার নাম মীর হাসান আলী। তার মাতার নাম আবেদা রোকাইয়া খাতুন। মীর হাসান আলী ছিলেন আরব দেশ থেকে যেসব বুজুর্গ পীর দরবেশ ও সৈয়দ এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারে এসেছিলেন, তাদেরই বংশধর। সেদিক থেকে তিতুমীরের বংশ সৈয়দ এবং মীর উভয় নামেই পরিচিত।

১৭৮২ সালে চব্বিশ পরগনা জেলার বাদুড়িয়া থানার হায়দরপুর কারো কারো মতে চাঁদপুর গ্রামে সৈয়দ নিসার আলী জন্মগ্রহণ করেন।

সৈয়দ নিসার আলী কিভাবে 'তিতুমীর' হয়ে গেলেন এবং তিতুমীর নামেই সারা ভারতবর্ষে পরিচিত হলেন, সে বিষয়ে মজার একটি গল্প রয়েছে। সেটি হচ্ছে–

সৈয়দ নিসার আলী বাল্যকালে খুবই রোগা ছিলেন। নানা প্রকার রোগ তাকে প্রায় সময়ই ধরে রাখতো। ফলে নিসার আলী দূর্বল ও লিকলিকে ছিলেন। এজন্য তার দাদী রোগ ব্যাধির হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য দেশীয় বনজ নানাবিধ ওষুধ খাওয়াতেন। দাদীর দেয়া ওষুধগুলো ছিল তিতা। কিন্তু নিসার আলী সেই তিতা ওষুধগুলো দ্বিধাহীনচিত্তে হাসিমুখে খেতেন। একটুও বিরক্ত হতেন না। দাদী দেখে অবাক হতেন এই ভেবে যে, এইসব তিতা ওষুধ নিসার অবলীলায় হাসিমুখে খেয়ে যাচ্ছে। তাই দাদী তার নাম রাখলেন 'তিতামীর'। সেই তিতামীর ধীরে ধীরে 'তিতুমীর' হয়ে যায় আর নিসার আলী নামটি লোকেরা প্রায় ভুলেই গেলো।

তিতুমীরের শৈশব শিক্ষা ছিল আদর্শ মুসলমান বালকের শিক্ষা। তিনি একজন খাঁটি ওস্তাদের কাছে কুরআন, হাদিস, ফেকাহ, ফরায়েয, দর্শন প্রভৃতি ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। তিতুমীরকে এ ধরণের শিক্ষাদানের কারণ হলো তাদের পরিবারগত ঐতিহ্য। তার বাবা ছিলেন একজন পরহেজগার ব্যক্তিত্ব। তিনিও ইসলাম প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। তাই বংশানু পরম্পরায় বা ঐতিহ্যগতভাবে সন্তান তিতুমীরকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়।

তিতুমীর ধীরে ধীরে শরিয়ত, মারেফত, হকিকত ও তরীকত সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং বড় বড় মজলিসে ধর্ম সম্পর্কীয় বক্তৃতা ও ওয়াজ নসিহত করার পারদর্শিতা অর্জন করেন।

শুধু তাই নয়, দাদীর বনজ ওষুধ সেবনে তার দেহ থেকে রোগ ব্যাধি দূর হয়ে যাওয়ায় তিনি একদিকে যেমন নিরোগ হলেন অন্যদিকে তেমনি ডন, কুস্তি, কাবাডি ও লাঠিখেলায় পারদর্শি হয়ে ওঠেন।

সেই একদা হার লিকলিকে তালপাতার সেপাই কিশোরটি ক্রমে একজন দক্ষ কুস্তিগীর ও লাঠিয়াল হয়ে ওঠলেন। এলাকার লাঠিয়ালরা তার সাথে লাঠিখেলায় জয়ী হতে না পেরে তার বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাকে ওস্তাদ হিসেবে শ্রদ্ধা জানায়। কুস্তিতেও তিতুমীর হয়ে ওঠেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, শুধু হায়দরপুর বা চাঁদপুর কেন পুরো চব্বিশ পরগনা জেলার কোন কুস্তিগীরই তিতুমীরের সামনে দাঁড়ানোর সাহস করতো না। রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে লোকজন জমায়েত করে কুস্তির প্রতিযোগিতা হয়। সেই প্রতিযোগিতায় তিতুমীর অতি সহজেই প্রতিপক্ষকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে পরাস্ত করেন। ফলে কুস্তি অঙ্গনেও তিতুমীর প্রধান ব্যক্তি হিসেবে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

একদিকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত অন্যদিকে শারীরিক ক্রীড়ায় পারদর্শি ফলে চব্বিশ পরগনা জেলার শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে তিতুমীর হয়ে ওঠলেন একজন প্রিয় মানুষ।

সর্বশ্রেণীর মানুষের ভালবাসা ও প্রীতির জন্যে স্বাভাবিকভাবেই সকলশ্রেণীর মানুষের প্রতি তিতুমীরেরও প্রীতি-মায়া-মমতার বন্ধন গড়ে

ওঠে। তিতুমীর তাদের দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র, তাদের অশিক্ষা-কুশিক্ষা-কুসংস্কার দেখে মনে কষ্ট পান। তাদের ওপর হিন্দু জমিদারদের, রাজাদের এবং নীলকরদের অত্যাচার-অবিচার-নির্যাতন দেখে ক্ষুব্ধ হন। তিনি একাকী ভাবেন-কী করে এসব মানুষকে মুক্ত করা যায়। তিনি ভাবেন—কী করে এইসব মূক-মূঢ়-ম্লান মুখে হাসি ফোটানো যায়। তিনি ভাবেন—কী করে মুসলমান সমাজকে নানাবিধ কুসংস্কার ও গোঁড়ামি থেকে সত্যিকার ইসলামের পথে আনা যায়। তিনি ভাবতেন আর পথ খুঁজে ফিরতেন।

তিতুমীর তার ওস্তাদ হাফিজ নিয়ামত উল্লাহর সাথে বাংলার বাইরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এবং আরবদেশে গমন করেন এবং প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করেন।

তিতুমীর যখন আরবের মক্কা-মদিনা শরীফে অবস্থান করছিলেন তখন আরবের নগরে আব্দুল ওহাবের নেতৃত্বে ওহাবী আন্দোলন চলছিল। এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে পাকা রাখা এবং মুসলমানদের জন্য একটি স্বাধীন রাজ্য গঠন করা।

মক্কায় হজ্বের মওসুম হচ্ছে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মিলন কেন্দ্র। সেই মিলন কেন্দ্রে ওহাবী আন্দোলন দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সৈয়দ আহমদ ছিলেন ওহাবী আন্দোলনের একজন অন্যতম নেতা।

সৈয়দ আহমদ খাস সৈয়দ ছিলেন বলে তার বিশেষ সম্মান ও প্রতিভাও ছিল। তিনি মুসলিম ধর্মগুরু দিল্লীর প্রসিদ্ধ আলেম শাহ আবদুল আজিজ ও শাহ অলিউল্লার প্রিয় শিষ্যও ছিলেন। ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমদের বহু নায়েব বা প্রতিনিধির মধ্যে তিনজন ছিলেন প্রধান–

নোয়াখালির মওলানা ইমামুদ্দীন, চট্টগ্রামের সুফী নূর মুহম্মদ এবং জৈনপুরের মওলানা কেরামত আলী।

সৈয়দ আহমদের আন্দোলন সারা ভারতের মুসলিম চিত্তে এমনই এক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল যে, পূর্ব বাংলার বহু মুজাহিদ দিনের পর দিন খেটে কঠোর পরিশ্রম ও অবর্ণনীয় ক্লেশ সহ্য করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গিয়ে উপস্থিত হন। এর ফলে সারাদেশের মুজাহিদগণ মিলে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে পেশোয়ারকে কেন্দ্র করে এক মুসলিম রাষ্ট্র গঠন

করে। খিলাফতে রাশেদিনের পরে এটিই মুসলমানদের প্রথম ইসলামিক রাষ্ট্র। অবশ্য সৈয়দ আহমদের শাহাদাতের পর এ রাষ্ট্রের পতন হয়।

"Syed Ahmed Come back from a visit to England convinced of the supreme importance of progressive education as a civilizing influence, and began the efforts which led to establisment of the Muhammadan Anglo -oriented college at Aligarh, with the object of combining Islamic culture with the education necessary for success under modern condition. Primarily for the Moslems the College, however, open to students of other religions, and the first graduate was a Hindu. The foundation stone was laid by Lytton in January 1877 and it has proved a successful and vigorous institution. It become a University in 1920 and in 1931 then were 1914 students in the University Proper and its dependent institutions. (History of India-Sir george Dunlen P-559-560).

স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড়ে মুসলমানদের উচ্চ ও আধুনিক শিক্ষার্থে একটি কলেজ স্থাপন করলেন। ১৮৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে এ কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন লিটন সাহেব। যদিও মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশে কলেজটি স্থাপিত হয়, কিন্তু অন্য ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীরাও এ কলেজে লেখাপড়া করার সুযোগ পেতো। এ কলেজের প্রথম গ্রাজুয়েট হন একজন হিন্দু ছাত্র। ১৯২০ সালে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। ১৯৩১ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৯১৪ জন।

স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা, আধুনিক চিন্তা মনন ও জীবনধারার এবং মুসলমানদের প্রগতির জন্যে এ ধরনের কলেজ স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন এজন্যে যে, ভারতবর্ষে তখন মুসলমানদের অবহেলা, অবজ্ঞা ও অপনীত করা হতো সর্বক্ষেত্রে। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের দেখতেই পারতো না—সহ্যই করতে পারতো না। মুসলমানদের 'ম্লেচ্ছ' ও 'যবন' বলে আখ্যায়িত করতো মুসলমানদের ছোঁয়া হিন্দুদের কাছে অপবিত্র বলে গণ্য হতো। কোনো কিছুতে মুসলমানদের স্পর্শ লাগলে তা তারা ফেলে দিতো। কোনো বস্তু ফেলা সম্ভব না হলে গোবর জল দিয়ে তা ধুয়ে পবিত্র করা হতো। ভারতবর্ষের

কোনো স্কুল-কলেজে তখন মুসলমান ছাত্রের ভর্তি হওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল। মুসলমানদের এমন করুণ অবস্থা ও অধঃপাতের অবস্থা উপলব্ধি করেই স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড় কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হন। তিনি দেখলেন যে, রাজা রামমোহন রায় হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষা ও আধুনিক জীবন ধারার জন্যে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন কিন্তু সেখানে মুসলমানের প্রবেশ নিষেধ। তখন তিনি আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠায় হাত দেন। Raja Ram Mohun Roy had done for the moral and intellectual rejuvenation of the Hindus Sir Syed Ahmed Khan accomplished for the Moslems. There would be no educated Muhammandan community existing and flourishing to day but for the heroic pionner efforts and far sighted vision of this greatman, who did not see in the later collapse of the Mogul empire an argument for recial estrangement and enmity. The Syed had shown conspicuous courage and loyalty to the British Goverment in 1857, and while he was not favourably inclined towards the Indian National Congress, he saw clearly enough the need for harmonious co-operation between Hindus and Moslems.

অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষার জন্যে আর স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের জন্যে প্রচেষ্টা চালান। তখন মুসলিম শিক্ষিত গোষ্ঠী তৈরী হওয়ার কোন সুযোগই ছিল না। এই মহান ব্যক্তিত্ব মুসলমানদের জন্যে সেই চেষ্টাই করেছেন। ১৮০৭ সালের দিকের ঘটনা এটা-স্যার সৈয়দ ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন ঠিকই। যদিও জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি তিনি অনুগত ছিলেন না কিন্তু তিনি গভীরভাবে অনুভব করতেন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় থাকা দরকার।

নয়

তিতুমীর পবিত্র হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন। সেখানে তিনি সৈয়দ আহমদের খিদমতে উপস্থিত হন। দু'জনের এই মিলন হলো সোনায় সোহাগা। একে অন্যের মন ও মননকে মুহূর্তেই যাচাই করে নিতে সক্ষম হলেন। তিতুমীর মনের মতো সর্বগুণধর পীরের সন্ধান পেলেন। ইতিপূর্বে তিতুমীর ভারতবর্ষে অবস্থানকালে অনেক পীর-মুরশিদের কাছে গেছেন, কিন্তু কোনো পীর মুরশিদই তার মন মতো হয়নি। এবারে সৈয়দ আহমদের সহবতে এসে তার মনপ্রাণ ভরে গেল–তিনি তার উপযুক্ত একজন পীর পেলেন বলে। একই সঙ্গে সৈয়দ আহমদও পেলেন একজন অসাধারণ মুরীদ।

তিতুমীর ১৯২৯ সাল পর্যন্ত হেজাযে অবস্থান করে একান্ত নিষ্ঠার সাথে ওহাবী শিক্ষা, সংগ্রাম ও যুদ্ধের নানাবিধ কৌশল দিকে পারদর্শিতা লাভ করেন।

তিতুমীর কাবাডি, কুস্তি ও লাঠি পরিচালনা প্রভৃতি দেশীয় খেলায় আগে থেকেই ছিলেন বিশেষভাবে পারদর্শী এবং অদ্বিতীয়। বর্তমানে উচ্চাঙ্গের যুদ্ধ বিদ্যায়ও হলেন মাহের বা সুপটু। শুধু এই নয়-তিনি ধর্মপীর সৈয়দ আহমদের সাথে হেজাযে অবস্থানকালে অনেকগুলো দেশ ভ্রমণ করেন। এতে তার জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়।

তিনি যেসব দেশ সফর করেন সেসব দেশের মধ্যে ছিল মদিনা, কুফা, কারবালা, দামেস্ক, ইরাক প্রভৃতি পবিত্র স্থান ও শহর।

শুধু দেশ ভ্রমণই নয়–এসব প্রসিদ্ধ ও পবিত্র স্থানে গিয়ে তিনি

বুযরগানে দ্বীন ও শহীদানের মাজার জিয়ারত করে হৃদয়ে বল সঞ্চার করেন।

তারপর পীর মুরীদ দু'জনে অর্থাৎ পীর সৈয়দ আহমদ এবং মুরীদ তিতুমীর উভয়ে মনের ভেতরে বিরাট সংকল্প নিয়ে ভারতের পথে রওনা হন। সৈয়দ আহমদ চলে গেলেন পাঞ্জাবে-আর তিতুমীর এলেন বাংলায় অর্থাৎ চব্বিশ পরগনায়। তাদের সে সংকল্পের ওয়াদাহ ছিল ভীষণ ও কঠিন।

দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত এবং ইসলামকে কলুষমুক্ত করা।

তিতুমীর মক্কা শরীফ থেকে দেশে ফিরে এসে দেখলেন, হিন্দু জমিদারদের মুসলমানদের উপর অত্যাচার জুলুমের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে। এই সময়ে হিন্দু জমিদার ও ইংরেজ কর্মচারীগণের অন্যায় অত্যাচার প্রজাদের ওপর এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল যে, কৃষ্ণদেব রায় নামে এক হিন্দু জমিদার মুসলমান প্রজাদের দাড়ির উপর মাথা প্রতি আড়াই টাকা হারে কর বসাতে ইতস্তত করেনি। তিতুমীর এই জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোবলের সাথে রুখে দাঁড়ান এবং এই কর পরিশোধ করতে মুসলমানদের নিষেধ করেন। তিনি জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ করতে শুরু করেন এতে গোবর ডাঙার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও পুর্নিয়ার জমিদার কৃষ্ণ রায় তাদের স্বার্থে, প্রতিপত্তিতে ও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে বলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

পবিত্র হজব্রত পালন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিতুমীর ওয়াজ মাহ্ফিলে ওয়াজ নসিহত এবং ধর্মীয় উপদেশ দিয়ে বেড়াতেন। তাতেও হিন্দু জমিদারদের গা জ্বলে যেতো। হিন্দু জমিদারদের গাত্রদাহের আরো কারণ, তারা দেখতে পেলেন তিতুমীরের ওয়াজ নসিহতে মুগ্ধ হয়ে অনেক মুসলমান তিতুমীরের শিষ্যত্ববরণ করছে। এতে তারা শঙ্কিত হয়ে পড়লো এই ভেবে যে, যদি মুসলমানরা তিতুমীরের পেছনে সংঘবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তা হবে তাদের জন্যে মারাত্মক ক্ষতির কারণ। এজন্যে হিন্দু জমিদাররা পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও শলা-পরামর্শ করে

নিজেরা তলে তলে একজোট হতে থাকে।

একে তো দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব, তদুপরি জমিদারদের এ অত্যাচার গরীব প্রজাদের মেরুদন্ড একেবারে ভেঙে যেতে বসেছিল। তিতুমীর এদের সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে দৃঢ় সংকল্প করেন।

অত্যাচারী জমিদারদের নায়ক ছিল জমিদার কৃষ্ণ চন্দ্র দেব রায়। জমিদার কৃষ্ণ দেব ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করে দিলো–

'যারা তিতুমীরের মুরীদ হবে তাদের জরিমানা দিতে হবে। যারা মসজিদ তৈরী করতে চাইবে, জমিদারকে নজর সেলামী দিতে হবে তাদের পাঁচশ থেকে হাজার টাকা। আর যারা দাড়ি রাখবে, তাদের কর দিতে হবে মাথা পিছু দু'টা থেকে আড়াই টাকা করে, মুসলমানী নাম কেউ রাখলে, জরিমানা দিতে হবে।'

ঢুলি ঢোল দেবার সময় আরো বাড়িয়ে দিলো। ঢুলি ঢোল বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করলো–

'মোছলেম ভাই বেরাদরেরা, জমিদার বাবুর হুকুম শোনো–পোলাপানের নাম যদি আরবীতে রাখো, নগদ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা জমিদারকে দিতে হবে। কেউ যদি গো-হত্যা করো, মোহর দিয়েও সে অপরাধের ক্ষমা জমিদার বাবুর কাছে পাবে না। কাটা যাবে জলজ্যান্ত একটি হাত। আরও শোনো, দল গড়ার জন্য কেউ যদি নিজের ভিটেয় তীতুকে জায়গা দাও, তার হবে কঠিন সাজা।'

ঢুলির এ ঘোষণার পর গ্রামে গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল। দরিদ্র মুসলমানগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তিতুমীরের কাছে গিয়ে জানাল–

'জমিদার এমন ঘোষণা দিয়েছে। এখন আমরা কি করবো?"

তিতুমীর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন তাদের কথা। তারপর ভারী গলায় বললেন–

'আমাদের অবস্থান যেখানে যেভাবে ছিল, এখনো সেখানে সে অবস্থাতেই থাকবে। আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে বাধা দেবার ক্ষমতা জমিদারের নেই।'

তিতুমীর জমিদার কৃষ্ণ দেবের কাছে একটি চিরকুট পাঠালেন। তাতে লেখা–

'আপনার হুকুমনামা ফিরিয়ে নিন কেউ আপনার হুকুম মানবে না মানতে রাজিও নয়।'

চিরকুট পেয়ে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হলো জমিদার কৃষ্ণ দেব। এতো সাহস একজন প্রজার। জমিদার কৃষ্ণ দেব এতটাই রেগে গেলো যেন হাতের কাছে পত্র লেখক তিতুমীরকে পেলে চাবকে তার পিঠের ছাল তুলে মনের ঝাল মেটাতো। কিন্তু দূতকে লক্ষ্য করে হুকুম দিলো–

'চাবকে ওর হাড়-মাংস এক করে দাও।'

যে কোনো দূতকে মারা তো দূরের কথা অপমান পর্যন্ত করতে নেই। এ নীতিবোধ জমিদার বিস্মৃত হয়। জমিদারের হুকুম পেয়ে পাইক বরন্দাজরা চাবুক মেরে দূতের এমন হাল করলো যে, শেষ পর্যন্ত দূত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

এ খবর গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে মুসলমান গ্রামবাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাতে থাকে–

'হে পরওয়ার দিগার, জালেম জমিদারকে তুমি শায়েস্তা করো।'

অন্যদিকে নিরীহ দূতের অত্যাচারিতের ও মৃত্যুর খবর শুনে তিতুমীর স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও উপলব্ধি করলেন–হাত পা গুটিয়ে থেকে নিরবে মার খাওয়া চলবে না। বেঁচে থাকতে হলে সকল অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

সামনে শীত। কিছু কিছু কুয়াশা জমেছে চারদিকে। পুরো গ্রাম যেনো ঢেকে আছে সাদা মসলিনের নরম পর্দায়। লোকজন রোজকার মতো যে যার কাজে ব্যস্ত। পুরুষরা খেতে খামারে। মেয়েরা ঘরের কাজে ব্যস্ত। মুড়ি নাড়ু খেয়ে বাচ্চারা বেরিয়েছে খেলতে। রাখালরা গরু চরাতে গিয়ে গাছতলা খুঁজে নিয়ে হাতে নিয়েছে বাঁশের বাঁশি।

বর্ষার দিনে কালো মেঘে ছেয়ে যায় যেমন আকাশ, তেমনি হঠাৎ ভয়ংকর কিছু জমিনে দেখে আঁৎকে ওঠলো গ্রামের লোক। পথ ছেড়ে, আল ছেড়ে, দমকা হাওয়ার মতো একদল লোক আসছে ছুটে। তাদের হাতে নানা রকম অস্ত্র, লাঠি সোটা। মুখে তাদের বুক কাঁপানো হুংকার। দলে দলে আসছে। সংখ্যায় যে কতো জানা যায় না।

গ্রামের মধ্যিখান দিয়ে কখনো ইংরেজ সিপাইরা মার্চ করে যায়। কখনো যায় বরযাত্রীর দল। বাড়ির বউ-ঝিরা বাড়ির শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে সেই তামাশা দেখে। আজও বেরুতে গিয়ে শুনলো চারদিক থেকে চিৎকার–'কে কোথায় আছ, পালাও। কৃষ্ণ দেবের লোকেরা গ্রাম আক্রমণ করেছে।'

অবেলায় কৃষকরা ফিরলো খেত থেকে। এই সময়ে দুশমনরা গ্রাম ঘেরাও করেছে–এখন উপায়?

উপায় কিছু করার আগেই শত্রুরা গ্রামের লোকজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। লাঠি, সুড়কি, দা, কুড়োলের ঘায়ে সমানে জখম হতে লাগলো মানুষ। স্ত্রী, পুরুষ, বাচ্চা কারুর রেহাই নেই সেই নিষ্ঠুর হামলা থেকে।

যে নদীটি গ্রামের পাশ দিয়ে কুলকুল রবে বয়ে গিয়েছে, সেই শান্ত নদীটি অশান্ত হয়ে ওঠলো–নদীর পানি লাল হয়ে গেলো মানুষের তাজা রক্তে।

সকালের সবুজ প্রাণবন্ত গ্রাম সন্ধ্যায় সাদা কাফন পরে যেনো গোরস্তান হয়ে গেছে নিঝুম নিরবতায়। কঠিন শোকে গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ে না–ঝরে না।

নিদারুণ ও মর্মস্পর্শী এই ঘটনার খবর শুনে চারদিক থেকে মুসলমানরা ছুটে আসতে লাগলো। তারা একজোট হয়ে এলো তিতুমীরের কাছে। বলতে লাগলো–

'আমাদের হুকুম দিন, রাজার মাথাটা এক্ষুণি কেটে নিয়ে আসি।'

কিন্তু তিতুমীর ধীর স্থির। রাগে দুঃখে ক্ষেপে গেলেও জ্ঞানবুদ্ধি হারান না। তিনি তাদের বোঝালেন –

'নবী করিম (সঃ) এর আদর্শ ও শিক্ষা ভুলে গেলে চলবে না। বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করতে হয়। পশুর সঙ্গে পশু হলে চলবে না। মানুষের নিজের কিছু করণীয় আছে, সব সময় সেগুলো মনে রাখতে হবে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তা পালন করে যেতে হবে।'

এদের বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিতে না দিতে আরো লোকজন এসে হাজির হলো। এদের মধ্যে ছিল তিতুমীরের ভাগ্নে গোলাম মাসুম। টগবগে তাজা

তরুণ। তেজী মামার মতই বটে। হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সবার সাথে দাঁড়িয়ে সে বললো–

'আমরা গোটা গ্রামের অবস্থা দেখে এসেছি। বিনা দোষে কোনোও মানুষ এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে, এটা আমাদের ধারণার বাইরে। এমন অবিচার-অত্যাচার নিরবে সহ্য করা মুসলমানদের ধর্ম নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত।'

অত্যাচারী জমিদারদের নায়ক ছিল জমিদার কৃষ্ণ চন্দ্র দেব। তার সাথে আরও কয়েকজন হিন্দু জমিদার হাত মেলায়। তারা এই মর্মে একত্রিত হয় যে, কিছুতেই তারা মুসলমানদের সংঘবদ্ধ হতে দেবে না। মুসলমানদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেবে না। একদিকে সাম্প্রদায়িক হীন মনোভাব অন্যদিকে প্রতিপত্তি ও আধিপত্যের রোষানল ও কোপানলে পড়ে যায় মুসলমান সমাজ।

কিন্তু তিতুমীরের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দরদীমন এবং তার বিশ্বস্ত মুরীদানের ঐকান্তিকতায় ঈমানদার ও পর্যুদস্ত মুসলমানদের মনে জোস্ আসতে থাকে। দেখতে দেখতে তাদের পাঁচ-ছ'শ' লোকের একটি দল গঠিত হয়। দৈনন্দিন ও নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম কর্মের সাথে এদল প্রত্যহ ডন, কুস্তি এবং লাঠি চালনা শিক্ষা গ্রহণ করে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

তিতুমীর তার দলবল নিয়ে সর্ব প্রথম খাসপুরের জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। খাসপুরের জমিদার ভেবেছিল তিতুমীরের মত লোক ও তার দলকে সহজেই পরাস্ত করতে সক্ষম হবে। খাসপুরের জমিদার তাই তিতুমীরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

দশ

কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ যখন শুরু হয়, যখন মুসলমানগণ 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন খাসপুরের জমিদারের দল প্রতিপক্ষের ভয়াবহ আক্রমণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচে। তিতুমীর এখানেই থেমে থাকেন না তিনি খাসপুরের জমিদার ও তার দলকে পরাজিত করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

এ ছিল ১৮৩০ সালের ঘটনা। এটা এজন্যে উল্লেখযোগ্য যে, একজন প্রতাপশালী জমিদার এই সর্বপ্রথম সাধারণ একজন মুসলমানের কাছে মাথা নত করলো। শুধু তাই নয়, এই প্রথম একজন হিন্দু জমিদার যার গর্ব, অহঙ্কার ও দম্ভ একজন মুসলমান ও তার মুসলিম দলের কাছে চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো।

তিতুমীর তার দলবল নিয়ে ইছামতি নদী পার হলেন। তার রক্তে যেন প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। এ যাবত কাল ধরে যে অত্যাচার-অবিচার, শোষণ–নির্যাতন চলছে, তা চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার দৃঢ় প্রত্যয় যেন তিনি নিয়েছেন। তিনি কিছুতেই আর থামবেন না।

ইছামতি নদী পার হয়ে তিতুমীর পুর্নিয়ার জমিদার বাড়ী আক্রমণ করলেন। জমিদার বাড়ীতে তখন ঢাক-ঢোল, কাড়া–নাকড়া বাজিয়ে মহাসমাবেশে বারোয়ারী পূজা হচ্ছিল। তিতুমীর ও তার মুসলমান লাঠিয়ালদের দেখতে পেয়ে হিন্দুরা প্রাণভয়ে পূজা-পার্বন ছেড়ে যে যেদিকে পারলো দৌড়ে পালালো। কিন্তু পুরোহিত পালাতে পারলো না। তাই এ আক্রমণের মুখে পুরোহিত নিহত হলো।

তিতুমীরের বিজয়ের খবর ও পুরোহিতের নিহতের খবর দু'টোই চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। মুসলমান সমাজে বিজয়ের ডঙ্কা বেজে ওঠল। আর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ-রোষ আক্রোশ দেখা দিল। বিশেষ করে জমিদারদের মধ্যে ক্ষোভ ও রোষ চরম আকার ধারণ করে।

জমিদার ও হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু লোক পুরোহিতের নিহত হওয়া এবং আরো অনেক কিছু মনগড়া অভিযোগ নিয়ে বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্টেটের কাছে যায় এবং তাকে এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্টেট কদমগাছির দারোগাকে তদন্তে পাঠালো। দারোগা একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। দারোগা তিনশ' বরকন্দাজ এবং চৌকিদার নিয়ে তিতুমীরকে শায়েস্তা করতে যায়।

তিতুমীর খবর পেয়ে প্রথমে দারোগাকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। দারোগাকে তিনি জমিদারদের অত্যাচার-নির্যাতনের কথা বলেন এবং মুসলমানদের প্রতি বিমাতাসুলভ ব্যবহারের কথা বলেন। কিন্তু দারোগা কিছুতেই এসব কথা কানে তুলতে নারাজ। সে তিতুমীরকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে শায়েস্তা করবে বলে ক্ষমতার দম্ভ দেখায়। তখন তিতুমীরের লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ফলে দারোগার দলের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

সংঘর্ষে দারোগা তো তিতুমীর বাহিনীর হাতে নিবৃত হয়ই উপরন্তু তার দেড়শ বরকন্দাজ ও চৌকিদার সবাই নিহত হয়, প্রাণে বাঁচার সুযোগ আর কারো হয় না।

তিতুমীর নিজেকে স্বাধীন শাসনকর্তা রূপে ঘোষণা দিলেন। স্বৈরাচার ও অত্যাচারমূলক শাসন ও শোষণ নির্মূল করে এদেশে একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েম করার ঐকান্তিক কামনা ছিল তিতুমীরের। তাই তিনি চব্বিশ পরগনা, যশোহর, নদীয়া এবং ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে একটি স্বাধীন রাজ্যের ঘোষণা দিলেন।

তিনি মিসকিন খাঁকে মন্ত্রী এবং গোলাম মাসুম খাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। আর সেই সঙ্গে সকল চাষীদের গোবরডাঙ্গা, পুর্নিয়া, খাসপুর,

চাঁদপুরসহ অন্যান্য স্থানের জমিদারদের কোনো প্রকার খাজনা না দেয়ার আদেশনামা প্রেরণ করেন।

এতে প্রতাপশালী জমিদাররা ভীষণ ক্ষেপে গেল। তাদের সারা দেহ যেন তেলে বেগুনে জ্বলতে লাগলো। তিতুমীর ও তার দলকে অর্থাৎ মুসলমানদের স্পর্ধাকে ধূলায় মিশিয়ে না দেয়া পর্যন্ত যেন তারা স্বস্তি পাচ্ছে না। তারা অর্থের বিনিময়ে, প্রলোভনের মারপ্যাঁচে ও ক্ষমতার দাপটে কিছু সংখ্যক প্রজা ও লাঠিয়াল নিয়ে তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য চেষ্টা চালায়।

জমিদার কৃষ্ণ দেব রায় এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কয়েকজন মুসলমানের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

মিসকিন খাঁ ছিলেন একজন বিশিষ্ট বীর, যোদ্ধা এবং তিতুমীরের নিকট আত্মীয় এবং একজন খাস মুরীদ।

এরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তিতুমীরকে একটি পরামর্শ দিলেন। তারা বল্লেন,

জমিদারদের সাথে সংঘর্ষ বাধা একদিনের ব্যাপার নয়। এ সংঘর্ষ চলতেই থাকবে। তাছাড়া, ইংরেজ শাসকদের সাথেও যুদ্ধ করতে হতে পারে। এমতাবস্থায় সকল সৈন্যের একটি নিরাপদ স্থান থাকা আবশ্যক। যেহেতু আমাদের প্রচুর অর্থ নেই, সেহেতু আমরা বাঁশ দিয়েও একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করতে পারি।'

গোলাম মাসুম তিতুমীরকে বললেন,

'গ্রামের বেড়াঘেরা ঘর মোটেও নিরাপদ নয়। বেড়া বনের জন্তু-জানোয়ার আটকাতে কাজে আসে। কিন্তু হিংস্র মানুষের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারে না। সবার জন্যে শক্ত ঘাঁটি চাই। নিরাপদ আস্তানা চাই।' তিতুমীর তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

"তুমি কি কিছু ভেবেছো?"

গোলাম মাসুম উত্তর করলেন,

'আমাদের একটা কেল্লা দরকার।'

'দরকার তো আমিও বুঝি। কিন্তু উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা কেউ

এমন পয়সাওয়ালা লোক নই যে, রাতারাতি কেল্লা বানিয়ে ফেলি। পুরনো কোনো কেল্লা দখল করবো তারও উপায় নেই।'

পরামর্শ হলো কি করা যায়। তারপর তারা এলেন সবাই বড়ো মাঠের কাছে। মাঠের মালিক ময়েজউদ্দিন বিশ্বাস। গোলাম মাসুম তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

'এই ময়দানের সমস্ত জমিই কি আপনার?'

বিশ্বাস সাহেব জানালেন,

'তার একার নয়, মুরীদদের শরিকানার জমি।'

ডাকা হলো সব শরিকদের। গোলাম মাসুম তাদের বুঝিয়ে বললেন,

'সবার আত্মরক্ষার জন্যে, নিরাপত্তার জন্যে, পুরো জায়গাটা ঘিরে ফেলা দরকার।'

তারা সায় দিলো এক সংগে–

'দরকার মনে করলে তাই করবেন। অত্যাচারীর জুলুমে আর ঘায়েল হতে চাই না। বরং তাদের বুঝিয়ে দিতে চাই, বিনা দোষে মার খাবার জাতি আমরা নই।'

'সাবাস! তোমাদের সাহস থাকলে আমরা কোনো শত্রুকে পরওয়া করবো না। সে জমিদার কৃষ্ণ দেবই হোক আর ধড়িবাজ ইংরেজই হোক।'

দলবেঁধে সবাই এলো সেই বড় মাঠটায়। বিশাল ফাঁকা চমৎকার জায়গা। নওয়াব সরাফরাজ খাঁ এই জমি লাখেরাজ মনজুর করে দিয়েছিলেন মসজিদ বানানোর জন্যে। গাঁয়ের লোকেরা মসজিদ তৈরী করেছিলো। কিন্তু রাখতে পারেনি। বর্গীর হামলায় তা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সেই থেকে জায়গাটা খালি পড়ে আছে।

'এক মসজিদ গেছে আর এক মসজিদ উঠবে, তৈরী হবে কেল্লা। নওয়াব বাদশাহরা পাকা দেওয়ালের কেল্লা তৈরী করে। আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের ক্ষমতার বাইরে কিছু পাবার উপায় নেই। তাই, ইটখোলার ইট নয়, পাহাড়ের পাথর নয়, হাতের কাছে আছে বাঁশ ঝাড়। তাই কেটে আমরা কেল্লা তৈরী করবো–বাঁশের কেল্লা।'

উৎসাহে উদ্দীপনায় লোকজন হৈ চৈ করে ওঠলো। কেল্লার কথা মনে

এলেই চুন সুরকি, লোহা-লক্করের কথা উঠে আসে। কিন্তু বাঁশ দিয়ে তা তৈরী হয়েছে, কেউ কখনো শোনেনি। কেউ যা করেনি নারকেলবাড়িয়ায় আজ চাঁদপুরের লোকেরা তাই করবে।

এগারো

তুমুল উৎসাহে সবাই বাঁশের কেল্লা তৈরীর কাজে লেগে গেলো। যার বাড়ির বাগানে যতো বাঁশ ছিলো, খুশি মনে দিয়ে দিলো। যুবক, বৃদ্ধ, বালক কেউ বসে নেই। সাধ্য মতো কাজ ভাগ করে নিয়েছে। মেয়েরা যোগাচ্ছে তাদের খাবার আর উৎসাহ।

দিন নেই, রাত নেই একটানা চলছে কেল্লা তৈরির কাজ। একদল ঝাড় থেকে কাঁচা বাঁশ কেটে আনছে। কেটে কুটে তৈরি করছে আরেক দল। আর একদল বেড়া বেঁধে, খুঁটি গেড়ে তৈরি করছে দুর্ভেদ্য দেয়াল। যতোটা সম্ভব শক্ত, মজবুত। দোহারা, তেহারা বাঁশের দেয়াল তৈরি হলো। উত্তর-দক্ষিণ দিকে প্রকান্ড সুরক্ষিত দরজা। ভেতরে পরিকল্পিত নকশায় মুরীদদের থাকার জন্য ঘর উঠলো। ছেঁচা বাঁশের বেড়া। নারকেল পাতায় ছাওয়া। হার্মাদ বর্গীরা যে মসজিদ নষ্ট করে দিয়েছিলো, সেই ভিটির উপর নতুন মসজিদ নির্মিত হলো।

কেল্লার প্রধান সেই ফটকে দাঁড়া করানো হলো সড়কিধারী পাহাড়াদার। দক্ষিণ দিকের দরজার বাইরে খোলা রাখা হয়েছিল কয়েক বিঘা জমি। এখানে সকাল বিকাল শরীর চর্চা, তলোয়ার, লাঠি, সুড়কি খেলার চর্চা শুরু হলো।

যুবক, কিশোর, বৃদ্ধ এমন কি মেয়েদেরও উৎসাহের কমতি নেই। জাতির জন্যে যুদ্ধ। পরিবারের জন্যে যুদ্ধ। তিতুমীরের নেতৃত্বে দিনে দিনে গড়ে ওঠতে লাগলো এক নির্ভীক মুক্তিবাহিনী। তাদের দৃঢ়পণ, দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তারা দেশের দশের ইজ্জত রক্ষা করবে।

বস্তুত তিতুমীরের সকল সৈন্যের আত্মরক্ষার জন্য এটি ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ আশ্রয়। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা নির্মাণে পুরো চব্বিশ পরগনায় হৈ হৈ রৈ রৈ রব পড়ে গেল। বিশেষ করে মুসলমান সমাজের মধ্যে এক ধরনের জোস পয়দা হলো। তারা যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠল। এতদিনকার বঞ্চনা- প্রবঞ্চনা, অত্যাচার-অবিচার, নিপীড়ন, নিস্পেষণ তারা আর সহ্য করবে না। অত্যাচারী হিন্দু জমিদার, অত্যাচারী নীলকর, অত্যাচারী ইংরেজ সকলের বিরুদ্ধে তারা লড়াকু মন নিয়ে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা ও উৎসাহ পেল।

দলে দলে দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন স্তরের মুসলমান তিতুমীরের সান্নিধ্যে আসতে লাগলো। তারা একদিকে যেমন ধর্মের তালিম নিতে শুরু করলো, অন্যদিকে যুদ্ধ বিদ্যায় কসরত গ্রহণ করতে লাগলো। তারা তাদের নেতা তিতুমীরকে এই প্রতিশ্রুতি দিলো 'জান দেবো তবু পেছন ফিরব না।'

তিতুমীর তাদের যেমন ধর্মীয় ও সামরিক প্রশিক্ষণ দিলেন তেমনি সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে তাদের নিয়ে এক সভা করেন। সভায় তিনি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেন। তিতুমীর তাদেরকে বুঝান যে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা না করতে পারলে, স্বাধীনভাবে কাজ না করতে পারলে, মুসলমান সমাজের মুক্তি নেই। পরাধীন জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। তিতুমীর বলেন, 'হিন্দুদের সাথে এবং ইংরেজদের সাথে আমাদের সামাজিক, ধর্মীয়, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কোনো মিল নেই। আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি নিয়ে আলাদাভাবে বাঁচতে হবে, আলাদাভাবে জীবন ধারণ করতে হবে; তাই আমাদের মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের। এই লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে—প্রয়োজনে আমরা শহীদ হয়ে যাবো।'

সমবেত মুরীদগণ 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিদ্বারা তিতুমীরকে তাদের সমর্থনের কথা জানিয়ে দেয়।

জমিদার কৃষ্ণ দেব রায় ও অন্যান্য জমিদারদের রোষানল ও কোপানলেও মুসলমানগণ পরাভব স্বীকার করল না। দিন দিন তিতুমীরের

শিষ্য সংখ্যা বাড়তেই লাগল।

জমিদার কৃষ্ণ দেব রায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠল। সে প্রমাদ গুনলো। তার মুখমন্ডল ভাবনা চিন্তায় গম্ভীর হয়ে গেলো। সে যেন দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছে তিতুমীর তার বিশাল দল নিয়ে এসে তার এ যাবতকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, অভিজাত্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি সব ভেঙে চুরমার করে ধূলায় মিশিয়ে দিচ্ছে।

জমিদার কৃষ্ণ দেব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠলো। না-এমনটি হতে পারে না। হতে দিতে পারি না। মুসলমান জাতির কাছে সনাতন হিন্দু ধর্ম মার খাবে ও তার ঐতিহ্য নষ্ট হবে এ কিছুতেই হতে পারে না।

জমিদার ভাবলো গভীরভাবে কি করা যায়। ভেবে ভেবে পথ বের করলো। প্রথমে সকল হিন্দু জমিদারদের একত্র করতে হবে। তাদেরকে মুসলমানদের উপযুক্ত জবাব দিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জমিদারদের সম্মিলিত আক্রমণ হলে তিতুমীর নিশ্চয়ই পরাজিত হবে। তখন তাকে গ্রেফতার করে শাস্তি প্রদান করে মনের ঝাল মেটানো যাবে।

ভাবনা-চিন্তা ইতিবাচক হলেও এবং এতে মন প্রফুল্ল হলেও কৃষ্ণ দেবের মনে পুনরায় দুশ্চিন্তার কালো মেঘের উদ্ভব হলো। কৃষ্ণ দেবের মনে হঠাৎ এ চিন্তা ঢুকল–জমিদারদের সম্মিলিত আক্রমণেও যদি তিতুমীরকে পরাস্ত করা না যায় তখন কি উপায় হবে!

জমিদার কৃষ্ণ দেব কূট কৌশলে পারদর্শী। স্থির করলো ইংরেজ শাসকদের বিষয়টি জানিয়ে এগুনো ভাল। ইংরেজ শাসকদের হাতে রেখে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারলে, আমাদের মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

কৃষ্ণ দেবের মনে স্বস্তি ফিরে এলো। সে যেভাবে করণীয় কাজ ভেবেছে–সেভাবেই কাজ শুরু করার জন্যে সচেষ্ট হলো।

বারো

আগের প্ল্যান অনুযায়ী কৃষ্ণ দেব রায় সকল হিন্দু জমিদারকে বিষয়টি অবগত করালো। এর ফলে সন্ত্রস্ত হয়ে সকল হিন্দু জমিদার কলিকাতায় একত্রিত হয় এবং তিতুমীরকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য এক ষড়যন্ত্র সভা করলো। এতে গোবরডাঙ্গার জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতার লাট বাবু, গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায় প্রমুখ জমিদার; বহু নায়েব, দারোগা এবং বহু হিন্দু দেশ-নেতা যোগ দেয়।

এ সভা বিরাটভাবে তিতুমীরের ধ্বংসের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। প্রত্যেক থানার হিন্দু দারোগা, ইংরেজ শাসক, গীর্জার পাদ্রী এবং নীলকর মালিকদের কাছে এ মর্মে চিঠি দেওয়া হয় যে, তিতুমীর হিন্দু এবং ইংরেজ উভয়কেই ধ্বংস করতে বসেছে। চাষীদের দল পাঠিয়ে নীল চাষও বন্ধ করার চেষ্টায় আছে। আর দেশের সর্বত্র অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে। এসব আয়োজন ও প্রচারের পর সকলে একযোগে তিতুমীরকে এবং তিতুমীরের বাঁশের কেল্লাকে ধ্বংস করার সংকল্প করলো।

যা সত্য নয় তাই সর্বত্র প্রচার করা হলো। নিজেদের দোষ-ত্রুটির কথা গোপন করে নিজেরা সাধু সেজে হিন্দু জমিদাররা চব্বিশ পরগনার নারী-পুরুষকে তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

তিতুমীরকে ইংরেজদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন ও দোষী সাব্যস্ত করার জন্যে সকল জমিদার সমস্বরে এই কথা বলে যে, তিতুমীর এক অত্যাচারী লাঠিয়াল, সে মুসলমানদের দল গঠন করে হিন্দু প্রজা সকলের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে, হিন্দু যুবতী নারী এমনকি বিধবা নারীর ইজ্জত

লুণ্ঠন করছে, মন্দিরের পুরোহিতকে খুন করছে, হিন্দুদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছে, জমি-জমার ফসল কেটে নিচ্ছে।

গোবরডাঙ্গা, চাঁদপুর, নারকেলবাড়িয়া, নদিয়া ও ফরিদপুরের সকল প্রজাসাধারণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। তিতুমীর সবাইকে বলছে–ইংরেজজাত খারাপ, তারা বিধর্মী, তারা জোর জবরদস্তি করে এলাকার নারী পুরুষকে খ্রীস্টান বানানোর চেষ্টা করছে। তারা বিজাতীয় সংস্কৃতি জনগনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে অহরহ চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে সর্বদা পায়ের তলে রাখতে চায়।

জমিদাররা ইংরেজদের বুঝিয়েছে–তিতুমীর ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে নীলচাষকারী প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলে নীলচাষ বন্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা জমিদারদের খাজনা দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

জমিদাররা ইংরেজদের এ-ও বুঝিয়েছে–তিতুমীর ইংরেজদের শাসনকে উপেক্ষা করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা করছে। তিতুমীর ইতিমধ্যেই চব্বিশ পরগণা, নদিয়া ও ফরিদপুর নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করে ফেলেছে–সে এসব এলাকার প্রজা সাধারণকে এ আদেশ দিয়েছে যে, তারা যেন জমিদার বা ইংরেজ কাউকে কোনো প্রকার খাজনা-কর না দেয়। খাজনা–কর–দক্ষিণা যা দিতে হয় তা যেন তিতুমীরকেই দেয়।

অথচ তিতুমীর ছিলেন শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রচারক এবং মুসলমানদের পীর ও মুরশিদ। তিনি চেয়েছিলেন শান্তির সাথে মুসলমানদের জাগরণ এবং সংস্কার বর্জিত সত্যিকার ইসলামের প্রতিষ্ঠা। তিনি চেয়েছিলেন বিদেশী শাসক এবং প্রতিবেশী হিন্দুদের হাত থেকে গরীব ও অত্যাচারিত মুসলমানদের রক্ষা করতে।

তবে, এখানে তার বাধা ছিল অসীম। এজন্য তিনটি প্রবল শক্তির সাথে তাকে লড়তে হলো–ইংরেজ শাসক, হিন্দু জমিদার এবং নীলকর কুঠিয়াল।

তিতুমীর ছিলেন অসম সাহসী এবং ধর্মগত একজন মানুষ। তিনি জানেন ভালো কাজ করতে গেলে বাধা-প্রতিবন্ধকতা আসবেই। সেসব

বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে চলার সৎ সাহস ও মানসিকতা তিতুমীরের রয়েছে। তাই তিতুমীর সকল বাধার সম্মুখীন হতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

তিতুমীর একজন নিরব সাধক। এ নিরব সাধকের দলে তখন এসে জুটেছে প্রায় ৮০ হাজার শিষ্য—যারা শুধু পীরের আদেশে এবং ধর্মের আহবানে যে কোন সময় শহীদ হতে প্রস্তুত।

সুতরাং কোন্ শক্তি এদের বাধা দেবে? সে বাধা যে মোটেই কার্যকরি হবে না। সকল বাধার দেয়াল খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে।

তিতুমীর যখন বহু চেষ্টা করেও শান্তিতে থাকতে পারলেন না— জমিদারদের ক্রমাগত জুলুম-অত্যাচার চরমে পৌঁছলো—কোনো প্রকার আশ্বাসের কথাই জমিদাররা কানে তুললো না— কলিকাতার ষড়যন্ত্রের পর একযোগে সকলে তিতুমীরকে আক্রমণ করে এদেশ থেকে মুসলমানদের তাড়ানোর মনস্থ করলো, তখন আশি হাজার সৈন্য নিয়ে (বীর মুজাহিদ) তিতুমীর দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন,

'এদেশে স্বৈরাচার ইংরেজ শাসনের কবর দেয়া হলো, আপনাদের নেতা আমি তিতুমীর, এদেশের স্বাধীন বাদশাহ। আপনারা যারা কৃষক, যাদের লাঙ্গল আছে তারাই জমির মালিক। আর এই দেশে, তিতুমীরের এই স্বাধীন রাজ্যে, সত্যিকারের ইসলামই বেঁচে থাকবে। কুসংস্কার অপসংস্কার জড়িত ইসলাম, যে ইসলামে পীর পূজা, কবর পূজা, গোলটুপি—লম্বাটুপি ইত্যাদি নিয়ে ঝগড়া ফ্যাসাদ হয় সে ইসলামের স্থান এ স্বাধীন মাটিতে নেই।

আমরা আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের অধিকার বজায় রাখার জন্যে এবং সত্যিকার ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অত্যাচারী হিন্দু জমিদার, রাজা-মহারাজা এবং ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়বো। প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জন দেবো। আপনারা এসবের জন্যে শাহাদাৎ বরণ করতে রাজি?'

সমবেত আশি হাজার মুরীদ দু'হাত তুলে হ্যাঁ সূচক সম্মতি জানালো এবং 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে স্থান মুখরিত হয়ে ওঠলো।

তিতুমীরের নেতৃত্বে মুসলমানরা সংঘবদ্ধ হয়েছে এবং তারা জেহাদের

জন্যে প্রস্তুত হয়েছে এ খবর গোবরডাঙ্গার প্রতাপশালী জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও পূর্ণিয়ার জমিদার কৃষ্ণ দেব রায়কে ভীষণ চিন্তায় ফেলে দিল। তারা আর নিরবে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারলো না। ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করে লাঠিয়ালের ব্যবস্থা করতে লাগলো।

সেসময় গোবরডাঙ্গার প্রতাপশালী জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ছিল নিজস্ব প্রায় তিনশ' লাঠিয়াল। জমিদার এইসব লাঠিয়ালকে ভালোভাবে তৈরি করে নিলো। কিন্তু জমিদার কালীপ্রসন্ন এই তিনশ' লাঠিয়ালের ওপর নির্ভর করতে পারলো না। তাই সে তার বন্ধু লাট বাবুকে ধরলো কলিকাতায় গিয়ে।

জমিদার কালীপ্রসন্ন তার বন্ধু জমিদার লাট বাবুকে সত্য মিথ্যা অনেক কিছুই তিতুমীরের বিরুদ্ধে তার কানে তুলে দিল। যেন লাট বাবু লাঠিয়াল ও অর্থ সামগ্রী দিয়ে তাকে সাহায্য করে। এক পর্যায়ে জমিদার কালী প্রসন্ন লাট বাবুকে বললো–

'তিতুমীর যেভাবে খেপেছে ও মুসলমান ম্লেচ্ছদের সংঘবদ্ধ করছে তাতে আমাদের ধর্ম ও জমিদারি তো শেষই; এমনকি আমাদের প্রাণটাও যাবে। এমত অবস্থায় আমরা হিন্দুরা একত্রিত না হলে এবং সবাই মিলে তিতুমীরকে বাধা না দিলে চরম পরিণতির অপেক্ষায় থাকতে হবে।'

এসব শুনে লাটবাবুর মাথা গরম হয়ে গেলো। জমিদারী রক্ষা ও মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্যে সেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। জমিদার কালী প্রসন্নের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করে বলল–

'মুসলিম ধর্ম নিধনযজ্ঞে আমি আপনাদের সাথে আছি। যত রকম সাহায্য সহযোগিতার দরকার হয় করবো। প্রয়োজনে প্রাণ দিয়ে দেবো। তবু ম্লেচ্ছ-যবন জাতি মুসলমানদের কচুকাটা করে ছাড়বো।'

এই বলে জমিদার লাটবাবু কলিকাতার দুশ' হাবশী লাঠিয়াল দিলো জমিদার কালী প্রসন্নকে। শুধু তাই নয়–তাকে বলে দিলে সে যেন পূর্ণিয়ার জমিদার কৃষ্ণ দেব রায়ের কাছে যায় এবং তাকেও এই মুসলিম নিধন যজ্ঞে অংশ নিতে বলে। জমিদার কালী প্রসন্ন তাকে আশ্বস্ত করে বলে যে, তার জন্যে লাট বাবুর কোন চিন্তা করতে হবে না। শুধু কৃষ্ণ দেবই নয়, অন্যান্য

জমিদারদের সাথেও সে যোগাযোগ করে তিতুমীরের বিরুদ্ধে তাদেরকে খেপিয়ে তুলবে।

জমিদার কালী প্রসন্ন ও লাটবাবু নিজেদের প্রস্তুতি নেয়া পর্যন্তই অপেক্ষা করলো না। বরং ইংরেজ শাসক ও নীলকর কুঠিয়ালদেরও এই গুরুতর বিষয়টি ফুলিয়ে ফাপিয়ে ও মন গড়া বিশ্লেষণ দিয়ে জানালো। এবং ইংরেজ ও নীলকরদের এমনভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করলো যে, ইংরেজ ও নীলকররা তাদেরকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিলো। এবং ইংরেজ ও নীলকরা তিতুমীরকে এই দেশ থেকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দেবার দায়িত্ব নিলো। এতে জমিদাররা খুশিতে বাগ বাগ হয়ে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান নিলো।

দেখতে দেখতে এমনই সময় এসে পড়লো, যখন হিন্দু জমিদার, ইংরেজ শাসক এবং নীলকর কুঠিয়াল সকলে মিলে একযোগে তিতুমীর ও তার দলকে, তার আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করার মতলবে সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

তেরো

হিন্দু জমিদারদের এই সংঘবদ্ধ হওয়ার খবর তিতুমীরের কাছে গোপন রইলো না। তার চৌকস গুপ্তচর বাহিনী সঠিক সময়ে ঠিক ঠিক সংবাদ এনে নেতার সমীপে পৌঁছে দিয়েছে। সংবাদ শুনে তিতুমীর মোটেই ঘাবড়ালেন না। তিনি দৃঢ় মনোবল নিয়ে সবাইকে ধর্ম ও ন্যায়ের পথে অটল থাকবার শক্তি যোগাতে লাগলেন।

জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো। তার যেন রাতে দিনে ঘুম নেই। মাথার মধ্যে এই দুষ্ট বুদ্ধি কিলবিল করতে থাকে–কি করে মুসলমান সমাজ ও তিতুমীরকে ধ্বংস করা যায়।

কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রাতের অন্ধকারে চুপিসারে মোল্লা হাটের নীলকর কুঠিয়াল ডেভিড সাহেবকে গিয়ে ধরলো। তার কাছে এমনভাবে কাকুতি মিনতি করে বলল যে ডেভিড তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না দিয়ে পারলো না। ডেভিড সাহেব তাকে দুশ' লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা দিয়ে সাহায্য করলো। জমিদার কালী প্রসন্ন খুশিতে বাগ বাগ হয়ে গোবরডাঙ্গায় ফিরে এলো এবং তিতুমীরকে আক্রমণ করার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল।

অতঃপর সত্যি সত্যি তাই হলো। হিন্দু জমিদারদের সম্মিলিত বাহিনী তিতুমীরকে আক্রমণ করে বসলো।

ধর্মের বলে বলীয়ান তিতুমীর অসম সাহসীকতার সাথে আপন লাঠিয়ালদের নিয়ে জমিদারদের সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিতুমীরের অমিত বিক্রম, সাহসীকতা ও রণকৌশলে

হিন্দু জমিদারদের লাঠিয়াল বাহিনীর অনেকে নিহত আহত হলো। প্রাণ ভয়ে অনেক লাঠিয়াল রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলো। যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় দেখে ও বেগতিক ভেবে জমিদার কালী প্রসন্ন ও কৃষ্ণদেব রায় ও অন্যান্য যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে গা ঢাকা দিলো।

নীলকর কুঠিয়াল ডেভিড সাহেব হিন্দু জমিদারদের পক্ষ নিয়ে এসেছিলো বজরা নিয়ে। তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদের পদানত করবে এবং তিতুমীরকে বন্দী করবে। এই আশায় ও ভাবনায় গদগদ হয়ে ডেভিড সাহেব এসেছিলো। কিন্তু তার সে গুড়ে বালি পড়লো। যুদ্ধে বেগতিক দেখে ও হিন্দুদের পরাজয় ও পলায়ন দেখে সে নিজেও প্রাণ বাঁচানোর জন্যে পালালো।

তিতুমীরের শিষ্যবর্গ হিন্দু জমিদার ও নীলকর ইংরেজদের খুঁজতে লাগলো। কিন্তু তারা কাউকে পেল না। সবাই প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেছে। তিতুমীরের শিষ্যবর্গের নজরে পড়লো নীলকর ডেভিড সাহেবের বিরাট বজরা। তারা সেই বিরাট বজরা পানি থেকে ডাঙায় তুলে আছড়িয়ে খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে ফেললো। যুদ্ধ বিজয়ে মুসলমান শিবিরে বিজয় উল্লাস দেখা দিল।

কিন্তু জমিদারগণ থেমে থাকলো না। তারা এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে পুনরায় সংঘবদ্ধ হওয়া শুরু করলো এবং অল্পদিনের মধ্যেই আবার তারা সংঘবদ্ধ হয়ে তিতুমীরকে আক্রমণের প্রস্তুতি নিলো।

জমিদাররা এবারের যুদ্ধের জন্যে সতর্কতার সাথে প্রস্তুতি নিয়েছে। গত যুদ্ধের পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেজন্যেও তারা যেমন লাঠিয়ালের সংখ্যা বাড়িয়েছে, তেমনি অন্যান্য রসদও বৃদ্ধি করেছে। এবারে তারা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েছে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তারা যুদ্ধে জিতবেই। তিতুমীরকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে তাদের ইচ্ছামতো তারা পিটিয়ে মেরে ফেলবে। হিন্দু জমিদারদের আক্রোশ এখানে–যবন ও ম্লেচ্ছ জাতি হয়ে মুসলমানরা তাদের সনাতনী ধর্মে হাত দিয়েছে। তাদের এতদিনকার প্রতিপত্তি ও আভিজাত্যে হস্তক্ষেপ করেছে। মুসলমানদের এ স্পর্ধা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করা যায় না। তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে।

এবারের যুদ্ধ বাঁধলো ইছামতি নদীর তীরে। হিন্দু জমিদার দলই প্রথমে আক্রমণ চালালো। তিতুমীর 'আল্লাহ আকবর' রবে হুংকার ছেড়ে নিজ দল নিয়ে সে আক্রমণ প্রতিহত করেন। প্রচন্ড যুদ্ধ বাঁধে। কোনো সময় হিন্দু দল আক্রমণ করে সম্মুখ দিকে এগুতে থাকে আর মুসলমান দল পিছু হটতে থাকে। আবার কোনো সময় তিতুমীরের দল প্রবল বিক্রমে সামনের দিকে এগুতে থাকে হিন্দু জমিদার দল পিছনে হটতে থাকে।

এমনিভাবে প্রচন্ড যুদ্ধ হতে হতে এক পর্যায়ে জমিদার কৃষ্ণ দেবকে মুসলমান লাঠিয়ালরা দেখতে পায়। আর যায় কোথায় মুহূর্তের মধ্যে তাকে মৌমাছির মতো ঘিরে ধরে মুসলিম সৈন্য দল। লাঠির আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে জমিদার কৃষ্ণ দেব রায়ের বহু বছরের সাজানো অভিজাত দেহখানি।

জমিদার কৃষ্ণ দেব রায়ের নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে হিন্দু লাঠিয়াল বাহিনী প্রতিশোধ স্পৃহায় পাগলা কুকুরের মতো হয়ে যায়। তারা তখন যুদ্ধ করা প্রায় বাদ দিয়ে তিতুমীরকে খুঁজতে থাকে। তিতুমীর অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি দেখলেন যুদ্ধে যে ফলাফল হওয়ার তাতো হয়েই গেছে। এখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করা নিরাপদ নয়। তাছাড়া তার লোকজন ক্লান্ত অবসন্ন। তারা বিশ্রামের জন্যে উদগ্রীব। এ মুহূর্তে যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করাই উত্তম। তাই, তিতুমীর যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে স্ব স্থানে ফিরে আসেন দলবল নিয়ে।

জমিদার কৃষ্ণ দেব রায়ের নিহতের খবরে পূর্ণিয়ার মুসলমান সমাজ বিজয় উৎসব করে। কারণ এই কৃষ্ণ দেব রায় একজন অত্যাচারী জমিদার ছিলো। যে মুসলমানদের তো সহ্য করতেই পারতো না এমনকি মুসলমানদের ধর্ম কর্মে বাধা দিতো। মুসলমানদের মনে আছে, এই কালো মনের জমিদার কৃষ্ণ দেব রায় মুসলমানদের মুখে দাড়ি রাখার জন্যে আড়াই টাকা করে কর ধরেছিলো। যারা কর দিতে অস্বীকার করে তাদেরকে জমিদার অকথ্য নির্যাতন করে।

এ ছাড়াও, মুসলমানদের লেখাপড়া, নিত্য দিনের বসবাস ও কাজকর্মে কারণে অকারণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতো। নিজের ইচ্ছামতো ট্যাক্স-

খাজনা দেবার হুকুম জারি করতো। কেউ না দিলে তাকে জনসমক্ষে অপমান অপদস্থ ও মারধোর করতো।

এ রকম নিষ্ঠুর ও প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারের নিহত হওয়ার খবরে মুসলমান সমাজ আনন্দিত হলেও বিষয়টি আইনের দোর গোড়া পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

কদম্বগাছি থানায় মামলা দায়ের করে জমিদার কৃষ্ণ দেবের আত্মীয়-স্বজন। একে তো ইংরেজরা হিন্দু জমিদারদের পক্ষে তাতে আবার হিন্দু জমিদারকেই মেরে ফেলা হয়েছে। কাজেই মামলা খুব তাড়াতাড়িই থানায় গৃহীত হলো। ইংরেজ স্থানীয় শাসক বলা চলে অনেকটা অতিরিক্ত উৎসাহ নিয়ে কয়েকজন সিপাহী নিয়ে দারোগাকে পাঠালো তিতুমীরকে ধরে আনার জন্যে।

তিতুমীর তো আগেই বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছেন। এবং সে রাষ্ট্রের বাদশাহ তিনি। সুতরাং থানার দারোগার হুকুম তিনি বা তার লোকজন মানবেন কেন? বরং তিতুমীরের হুকুমে দারোগা চলবে।

কিন্তু দারোগা তিতুমীরের কোনো কথা না শুনে হম্বিতম্বি করতে থাকে। ইংরেজ শাসক ও হিন্দু জমিদারদের ক্ষমতার দোহাই দেয়। এক কথায় দু'কথায় তিতুমীরের সাথে দারোগার বিরোধ বেধে যায়। দারোগার ঔদ্ধত্য ও অশালীন ব্যবহার দেখে তিতুমীরের লোকজনের ধৈর্য্যের বাধ ভেঙে যায়। অতঃপর তারা দারোগা ও তার সঙ্গীদের হত্যা করে।

ইংরেজ শাসকদের অনুগত দাস দারোগা ও বরন্দাজদের তিতুমীর খুন করেছে এ খবর রাষ্ট্র হয়ে পড়লে হিন্দু জমিদার ও ইংরেজ শাসকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়।

হিন্দু জমিদারগণ বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার আলেকজান্ডারের শরণাপন্ন হয়ে করজোরে ফরিয়াদ জানায়-

'হুজুর আপনি আমাদের মা-বাপ, আমাদের ত্রাণকর্তা। ভগবানের পর আপনাকেই আমরা চোখের সামনে ত্রাণ দেবতা রূপে দেখতে পাচ্ছি। আপনি না বাঁচালে মুসলমানরা আমাদের মেরে ভূত বানিয়ে ফেলবে। আপনি আমাদের বাঁচান।'

ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার আলেকজান্ডার মুসলমানদের ওপর আগে থেকেই রুষ্ট হয়েছিলো। আগুনে যেন ঘি পড়লো। মিষ্টার আলেকজান্ডার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করলো। এবং মুসলমানদের আক্রমণ ও শায়েস্তা করার জন্যে মনস্থির করলো।

বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার আলেকজান্ডার তিতুমীর ও তার দলকে সমুচিত শাস্তি দেওয়ার জন্য বাঙালি হিন্দু লাঠিয়াল, বরকন্দাজ এবং কিছু গোরা সৈন্য সমন্বয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করে। এ গোরা সৈন্যদলে কিছু অশ্বারোহীও নেয়া হলো।

শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে মিস্টার আলেকজান্ডার মনে মনে প্রীত হলো এই ভেবে যে, এবারে তিতুমীর ও তার বাহিনী যাবে কোথায়। পরাজয় বরণ করে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার না করে তার কোনো উপায় থাকবে না। স্বাধীন বাংলা গঠন করা ও তার বাদশাহ হওয়ার স্বপ্ন সাধ চিরতরে রুদ্ধ হবে।

আলেকজান্ডারের শক্তিশালী বাহিনী গঠনের কথা তিতুমীরের ও তার মুরীদদের কাছে অজানা রইলো না। তিতুমীর এই শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে কীভাবে, কোন্ কৌশলে যুদ্ধ করতে হবে তার প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন তার অনুচরদের। তিতুমীরের শিষ্যবর্গ মনপ্রাণ দিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে লাগলেন। বিশেষ করে অশ্বারোহী বাহিনীকে কীভাবে পর্যুদ'স্ত করতে হবে সে শিক্ষায় তারা প্রশিক্ষিত হলো।

চৌদ্দ

সেদিন ছিল সোমবার। মুসলমানদের জন্য সোমবার দিনটি অত্যন্ত মর্তবার। এদিন রাসূলে করিম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোস্তফা এ ধরাপৃষ্ঠে আগমন করেন। এই মহামানবের আবির্ভাবের কারণে দিনটি মুসলমানের জন্য অত্যন্ত শুভ।

তিতুমীর তার দলের যোদ্ধাদের এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন,–

'হাজেরানে মজলিশ, আমরা আল্লাহর সত্যিকার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্যে, অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার-শোষণ-নির্যাতন ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছি। আমরা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীকার আদায়ের জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। এ যুদ্ধে আমরা মরলে হবো গাজী। যুগযুগ ধরে ইতিহাসের পাতায় আমাদের এ বীরত্বের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আজকের এই পবিত্র দিনে আল্লাহকে স্মরণ করে আমরা যুদ্ধে রত হবো–নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদেরকে জয় যুক্ত করবেন।'

এই ভাষণের পর 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি সহকারে তিতুমীর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

প্রচন্ড যুদ্ধ হলো। হিন্দু লাঠিয়ালরা এবং অশ্বারোহীরা তিতুমীরের বাহিনীর উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। কিন্তু তিতুমীরের বাহিনী অপূর্ব রণকৌশলে আক্রমণ প্রতিহত করে এবং পাল্টা আক্রমণ চালায়। এমনি ধারায় আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ চলতে থাকে।

যুদ্ধ চলাকালীন আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ জমেছিল। দুপুরের দিকে সেই

খণ্ড খণ্ড মেঘগুলো একত্রে জমাট হয়ে বাতাস ভারী হয়ে হলো। আছরের নামাজের সময়কালে প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। বর্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ চলছে। বর্ষণের ফলে জমিন ভিজে কাদায় পরিণত হলো। কাদায় ঘোড়ার দৌড়াতে অসুবিধা দেখা দিল। দৌড়াতে গিয়ে পা পিছলে ঘোড়া সোয়ারীসহ পড়ে যেতে শুরু করলো।

প্রবল বর্ষণের এই সুযোগ মুসলমান বাহিনী ত্বরিৎ কাজে লাগিয়ে ফেললো। তারা অশ্বারোহী বাহিনীকে অতি অল্প সময়ে এবং অনেকটা সহজে পরাভূত করে ফেললো ফলে যুদ্ধের মোড় দ্রুত পালটে যেতে থাকলো।

বর্ষণের ফলে মুসলমানদের আরো একটি সুবিধা হলো তারা রোদ বৃষ্টি ঝড়ে মাঠে-ময়দানে ও খেতে-খামারে কাজ করে অভ্যস্ত। কিন্তু হিন্দুরা সে রকম অভ্যস্ত নয়। তাই মুসলমানরা সমান শক্তি ও সাহস নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকলেও হিন্দুরা ক্রমশ মৃয়মান হতে শুরু করলো। সন্ধ্যা নামার আগেই আলেকজান্ডারের সৈন্যদল ভিজে ল্যাপথ্যাপ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেলো। এ যুদ্ধে আলেকজান্ডারের প্রচুর সৈন্য এবং অশ্বারোহী নিহত হয়।

এ যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর তিতুমীর ও তার বাহিনী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন।

সমগ্র চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলার অধিবাসীদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মালো সত্যি সত্যি তিতুমীর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর সে স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসনকর্তা তিতুমীর নিজে। এই দেশ আর ইংরেজদের নয় বা হিন্দু জমিদারদের নয়। এদেশে তারা স্বাধীনভাবে বসবাস, চলাফেরা ও জীবন যাপন করতে পারবে। এই বোধ মনের মধ্যে জাগ্রত হওয়ায় সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।

পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা বিলীন হওয়ার পর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সংকট ও মহা দুর্দিন শুরু হয়। কেবলমাত্র রাজনৈতিক সার্বভৌমিত্বই নয়, কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কার্যকলাপে মুসলিম সমাজের মর্যাদা ও ঐক্য বিলুপ্ত হয়।

ওয়ার্ডারের মতে, "অন্যান্য কাজ কর্মের মত ধর্মও অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্তরে পৌঁছায়।" মুসলিম জাতির এই মহাসংকটে কতিপয় মুসলিম চিন্তাবিদ, সমাজ

সংস্কারক ও ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য যেসব নিষ্পেষিত প্রাণ আত্মনিয়োগ করেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–মুহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হাজী শরীয়তুল্লাহ, শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী এবং তিতুমীর।'

আলেকজান্ডারের সাথে যুদ্ধে তিতুমীরের বিজয় ইংরেজদের মনে শেলসম বিদ্ধ হলো। এ পরাজয়ের পর ইংরেজদের টনক নড়লো। তারা সত্যিকারভাবে ভীত হয়ে পড়লো। কারণ, ইংরেজরা দেখছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কাছ থেকে লর্ড ক্লাইভ যে স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে-আজ তিতুমীর সেই স্বাধীনতা ইংরেজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই ইংরেজরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, যে কোনোভাবেই হোক তিতুমীরকে থামাতে হবে এবং তাকে মেরে ফেলতে হবে। ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা কোনোদিনই যেন বাঙালিরা নিতে না পারে।

এরই প্রেক্ষিতে ১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে চব্বিশ পরগনা জেলা কর্তৃপক্ষ তিতুমীরের বিরুদ্ধে একটি বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে।

এ যুদ্ধে তিতুমীর গেলেন না। তিতুমীরের পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করেন তিতুমীরের প্রধান শিষ্য ও সেনাপতি মহাবীর গোলাম মাসুম।

যুদ্ধে জেলা কর্তৃপক্ষের বিরাট বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। জেলা কর্তৃপক্ষের বাহিনীর প্রচুর সৈন্য নিহত হয়।

জেলা কর্তৃপক্ষ ঘৃণা লজ্জা ও ক্ষোভে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তার সকল আক্রোশ নিয়ে পড়ে তিতুমীরের ওপর। সে তিতুমীরকে ওহাবী দলের নেতা এবং ইংরেজ বিদ্বেষী ইত্যাদি প্রমাণ করে এদেশে ইংরেজ শাসন কায়েম রাখার জন্য বড়লাট লর্ড বেন্টিং এর কাছে যুদ্ধ সাহায্য চাইলো।

বেন্টিং তার আবেদনে সাড়া দিল এবং একদল সশস্ত্র সৈন্য পাঠালো। সে সৈন্য দলে কামানও ছিল। পূর্বের কয়েকটি যুদ্ধে তিতুমীরের শিষ্যবর্গ এতটাই উৎফুল্ল হয় যে, মৃত ইংরেজ সৈন্যদেরকে বাঁশের কেল্লার চারদিকে লটকিয়ে রাখে। এতে ইংরেজ, হিন্দু জমিদাররা এবং নীলকর কুঠিয়ালদের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন দ্বিগুন জ্বলে ওঠে।

এদিকে চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুরের কিছু অংশ নিয়ে গড়া তিতুমীরের স্বাধীন রাজ্যে আনন্দের বন্যা বইতে থাকে। তিতুমীরের

শিষ্যবর্গ বলা চলে অনেকটা অহংকারী ও গর্বিত হয়ে ওঠে। তারা মনে করে যে, তারা বিজয়ী হয়েছে–এভাবেই তাদের দিন অতিবাহিত হবে। তাদেরকে আর কেউ পরাজিত করতে পারবে না।

অন্যদিকে তিতুমীর অনুভব করছিলেন যে, তার অনুচরর্গদের অহংকারবোধ ও অতি আনন্দিত হওয়া সমূহ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই তিনি অনুচরবর্গদের সংযত ও সাবধান হওয়ার জন্যে উপদেশ দেন। কিন্তু অনুচরবর্গ তিতুমীরের কথায় সামান্যই কর্ণপাত করে।

তিতুমীর যখন জানতে পারলেন যে, ইংরেজ লেফটেন্যান্ট স্টুয়ার্ডের বাহিনীতে কামান রয়েছে, তখন তিনি প্রমাদ গুণলেন। কারণ, কামান দূর থেকে গোলাবর্ষণ করে তার বাঁশের কেল্লা বিধ্বস্ত করে দিতে পারে। তখন স্টুয়ার্ডের সৈন্যদলকে তিতুমীরের বাহিনী সামান্য স্পর্শও করতে পারবে না।

তবুও যেহেতু যুদ্ধ করতেই হবে তাই তিতুমীর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং তার বাহিনীকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

তিতুমীর যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন বটে, কিন্তু এই প্রথমবারের মতো তিতুমীরের বুক কেঁপে ওঠলো। এতোবড় বীর, কুস্তিগীর, খ্যাতনামা লাঠিয়াল তিতুমীর, তবুও এবারের যুদ্ধে তার বুক কাঁপলো। কিন্তু কোনো উপায় নেই। পরিণাম যা হবার তা তবেই, তাকে বরণ করতেই হবে। স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলেও দেবেন; তবু তিতুমীর পিছপা হবেন না।

ধর্মের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে, আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়ে তিতুমীর নিজ বাহিনীকে নিয়ে ইংরেজ বাহিনীর মুখোমুখি হলেন। যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে তিতুমীর তার বাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন–

'নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা, সত্য ইসলাম রক্ষা এবং দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছি। যে ইংরেজ গোষ্ঠী আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে আমরা তাদের কাছে মাথা নত করবো না। যে হিন্দু জমিদার গোষ্ঠী আমাদের উপর আমাদের ধর্মের উপর আঘাত হেনেছে তাদের আমরা ক্ষমা করবো না। এ যুদ্ধে হয় আমরা শহীদ হবো নয়তো গাজী হবো।'

এই দৃপ্ত ভাষণের পর আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি তুলে তিতুমীর যুদ্ধ শুরু করেন।

পনেরো

যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র কিছুক্ষণ পরেই স্টুয়ার্ড বাহিনী একটু দূরের অবস্থান থেকে কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। এবং সে গোলা নিক্ষিপ্ত হয় তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ও তিতুমীরের অবস্থানকে লক্ষ্য করে। কামানের গোলায় অল্পক্ষণের মধ্যে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। বহু সৈন্য হতাহত হয়। অনেকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাণ নিয়ে বাঁচে।

এক সময়ে কামানের গোলায় তিতুমীরও শহীদ হন।

তিতুমীর শহীদ হয়েছেন এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পরপরই তিতুমীরের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হওয়া শুরু করে।

যুদ্ধের ফলাফল করুণ ও বেদনাদায়ক হয়। তিতুমীর ও তার বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে।

বাঁশের কেল্লা বিধ্বস্ত হয়। অনেক অনুচর ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে।

সেই সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতার অগ্রনায়ক তিতুমীরের অবসান ঘটে।

যুদ্ধ শেষে লেফটেনেন্ট স্টূয়ার্ড তিতুমীরের প্রধান সহকর্মী ও আরো অনেক অনুচরদের বেঁধে সঙ্গে নিয়ে আসে বারাসাতে। সেখান থেকে তাদের কলিকাতায় চালান দেয়া হয়।

প্রধান সহকর্মীর বিচার হয় এবং রাজদ্রোহীতার অপরাধে তাকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিয়ে মারা হয়। অন্যান্য গ্রেপ্তার করা অনুচরদেরও বিচার হয়। বিচারে রাজদ্রোহী প্রমাণিত হওয়ায় তারা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হয়ে

আন্দামানে নিক্ষিপ্ত হয়।

এরপরও যারা অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছে তাদের মধ্যে রাফিক মন্ডল ও ইব্রাহীম মন্ডলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একথা নিঃসন্দেহ, বাংলার যে স্বাধীনতা ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজরা নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল সেই স্বাধীনতা আবার পুনরুদ্ধারের জন্যে বাংলায় চেষ্টা করেন তিতুমীরই প্রধান ও প্রথম ব্যক্তি।

তিতুমীর পাক-বাংলার স্বাধীনতার প্রথম শহীদ।

ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, যুগে যুগে এমন একেক জন মহান পুরুষের আবির্ভাব ঘটে যিনি সারা দুনিয়ার রূপ বদলিয়ে দেন।

এরকমই একজন যুগ-নায়ক ছিলেন আবদুল ওহাব। মুসলমানদের পবিত্র যিয়ারতগাহ, মক্কা-মদীনায় অনৈসলামিক কার্যাবলী দেখে মর্মাহত হয়ে ইসলামকে সংস্কার ও অনাচারমুক্ত করার সংকল্প নিয়ে তার সংগ্রাম শুরু হয়।

তার এই সংস্কার আন্দোলনই ওহাবী আন্দোলন।

আবদুল ওহাব প্রচারিত ওহাবী আন্দোলনের পরবর্তী বিশিষ্ট নেতা সৈয়দ আহমদ। সৈয়দ আহমদের সময় এ ফরায়েযী আন্দোলনও ওহাবী ফরায়েজী আন্দোলনে মিলিত হয়ে এক সংগ্রামী রূপ ধারণ করে।

এরই সমসাময়িক ছিলো বাংলায় তিতুমীরের জাগরণ।

প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ আহমদের বালাকোট পতনের পরও সারা ভারতে ওহাবী আন্দোলন ও মুসলিম জাগরণের আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে মনে করলে ভুল করা হবে।

সৈয়দ আহমদ তার মুরীদানের অন্তরে যে অগ্নিমন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন, তার মৃত্যুর পরও তা অনির্বাণ শিখায় জ্বলছিল। এরই পরিণতি দেখা যায় সীমান্তে, ইস্তানায়, পাটনায়, টঙ্কে এবং দেওবন্দের মুজাহিদ আন্দোলনে।

তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল অধিক। তারা ইংরেজদের পদলেহন করে নিজ ও গোষ্ঠীর স্বার্থ আদায় করে নিতো। স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা অসত্য কথা-কাহিনী ইংরেজদের

কানে ওঠাতো। এতে মুসলমান সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজদের বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠে।

ইংরেজরা হিন্দুদের খাতির যত্ন করতো। কেননা তাদের সহযোগিতায় ইংরেজ শাসকগণ বাংলার এবং সারা ভারতে ক্ষমতা জমিয়ে নেয়।

এতে মুসলমান সম্প্রদায় পড়ে বেকায়দায়। মুসলমানদের মতো আত্মসম্পন্নবোধ ভারতীয়দের পক্ষে, ইংরেজ কাফেরদের সাথে হাত মেলানো সহজ ছিল না। বিশেষত সৈয়দ আহমদ ও তিতুমীর শহীদানের শিক্ষার ফলে ইংরেজ জাতি ছিল মুসলমাদের কাছে আরও ঘৃণার পাত্র।

এ ঘৃণা ও আত্মসম্মানবোধের ফলে মুসলমানগণ আধুনিক শিক্ষা হতে যেমন পেছনে পড়ে রইলো, সেরূপ আর্থিক উন্নতিতেও ততখানি পশ্চাদপদ রইলো। এ অবস্থার ইঙ্গিত করেই প্রসিদ্ধ লেখক হানটার বলেছিলেন-

A hundred and seventy years ago it was almost impossible for a well born Mussalman in Bengal to become poor, at present, it is impossible for him to continue rich.

বাস্তবিকই এটি মর্মান্তিক যে -দেড়শ বছর আগে যে মুসলমানদের পক্ষে গরীব হওয়া ছিল অসম্ভব; তাদের পক্ষে বর্তমানে ধনী থাকাই অসম্ভব।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক থেকেই মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল। তারা, বলা চলে, ইংরেজ ও হিন্দুদের গোলাম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সৈয়দ আহমদ ইসলাম ধর্ম সংস্কার ও মুসলমানদের জন্যে যে জেহাদ আহবান করেন তা তার বক্তৃতা, মন্তব্য ও চিঠিপত্রেও দেখা যায়। পাক-ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের প্রতি তিনি যে আহবান জানান তা তার লিখিত একটি চিঠিতে এরূপ ভাবে জানা যায়-

"তাহাদের এক বিরাট সেনাদল এদেশের অনেক জায়গায় এসে পৌঁছেছে। তাদের উদ্দেশ্য এদেশকে হত্যা ও লুটতরাজের ভূমিতে পরিণত করা। আপনার উচিত এ আহবানলিপি পাওয়া মাত্রই সাহসীকতার সাথে

আমবালার অন্তর্গত চামাড়ার বনভূমিতে চলে আসা। আপন সাথীদেরও এ খবর দিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসুন।......

এ উপদেশ পাওয়ামাত্র অনতিবিলম্বে চলে আসুন। তা না হলে এ ঘৃণিত কাফের সারা এলাকা ধ্বংস করে ফেলবে। আর এদেশকেও নিজেদের রাজ্যভুক্ত করে নেবে।...

তারপর আমাদের ধর্মও দেশ-বিদেশীদের হাতে যেয়ে পড়বে। তাই বলছি ইসলামের মহব্বত, ঈমানের নীতি এবং ধর্মের হিতার্থে এ সুযোগ ছাড়বেন না।

কাফেরগণ অতি শঠ ও দাগাবাজ। তারা ফেরেব ও শঠতার জাল বিছিয়ে এ অঞ্চলে প্রবেশ করবে। তারা লোকদের দেখাবে এবং বুঝাবে তোমাদের সাথে আমাদের কোনো ঝগড়া নেই। তোমাদের কোনো অনিষ্ট করবো না– এর সাথে সাথে তারা টাকা পয়সারও লোভ দেখাবে।

আপনাদের উচিত কাফেরদের চালবাজিতে বিশ্বাস না করা। বিশ্বাস করার–সুযোগ পেলেই তারা আপনাদের সর্বনাশ করবে, ক্ষতি করবে, আর সম্মানের হানি করবে। শুধু তাই নয়, ধন দৌলত সব কিছু লুটে নিয়ে আপনাদের ধর্মচ্যুত করেও ছাড়বে।

তখন শুধু আফসোসের হাত মলতে হবে। তাই সময় থাকতে সাবধান করলাম।'

সৈয়দ আহমদের আহবানে মুসলিম জাহানে নব জাগরণের সাড়া পড়ে যায়। মুসলমানরা দলে দলে তার মুরীদ হতে থাকে। তিনি আফগান সীমান্তে অবস্থিত সিতানাকে তার সামরিক কেন্দ্র করেন। তিনি তার গুণমুগ্ধ মুরীদদেরকে একটি সুশিক্ষিত সামরিক বাহিনীতে পরিণত করেন।

এ সময় শিখ নেতা রণজিৎ সিং মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন এবং তাদের ওপর জুলুম করতে থাকেন। এ সংবাদ পেয়ে শিখদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য সৈয়দ আহমদ জিহাদ ঘোষণা করেন।

১৮২৬-৩০ সালে পরপর কয়েকটি যুদ্ধে তিনি ও মুজাহিদ বাহিনী রণজিৎ সিংয়ের সুশিক্ষিত খালসা বাহিনীকে পরাজিত করে পেশোয়ার

অধিকার করেন।

পেশোয়ারের শাসনভার দেন কাবুলের আমীর দোস্ত মুহম্মদের ভ্রাতা সুলতান মুহম্মদের ওপর। এভাবে সৈয়দ আহমদ পেশোয়ারে ইসলামী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন।

কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রণজিৎ সিং শঠতার আশ্রয় নেয়। অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে সে পাঠান সরদারদের সৈয়দ আহমদের পক্ষ ত্যাগ করায়। সীমান্তের পাঠান ও উপজাতীয়রা সৈয়দ আহমদের আন্দোলনকে কুসংস্কার বশত অকপটে গ্রহণ করতে পারে না। তাদের অনেকেই তার দল ত্যাগ করলো। কিন্তু এতে তিনি না দমে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

বালাকোট নামক স্থানে শিখদের সাথে তার তুমুল যুদ্ধ হলো। প্রিয় মুরীদ ইসমাইল এবং আরও মুজাহিদ শিখদের হাতে শহীদ হলেন। খাবী খাঁ নামে এক পাঠানের বেঈমানীতে সৈয়দ আহমদও শহীদ হলেন (১৮৩১ সাল)।

সৈয়দ আহমদ শহীদ হলেও তার রেখে যাওয়া, আদর্শ, বক্তব্য, মন্তব্য চিঠিপত্র ও কর্মপ্রবাহ মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন সময়ে অনুপ্রাণিত করে।

তিতুমীর তেমনি একজন মুসলিম নেতা যিনি তার কর্মপ্রবাহ এবং এ ধরনের চিঠিপত্রে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং কর্তব্য কর্মে সাড়া দেন।

ষোল

ইসলাম প্রচারক তিতুমীরকে হিন্দু জমিদার ও লেখক শ্রেণী হেদায়েতপন্থী বলে আখ্যা দিয়েছিল। জমিদারগণ এ হেদায়েত পন্থীদের উপর নানারূপ জঘন্য অত্যাচার ছাড়াও প্রত্যেকের প্রতি মাথা পিছু পাঁচ শিলিং হারে কর ধার্য করেছিল।

ইংরেজ শাসকরাও তিতুমীরের দলকে সরকার বিরোধী আখ্যা দিয়ে অপরিসীম অত্যাচার করতে থাকে।

এসব বাধা পেয়ে তিতুমীর দমে যাননি। বরং তার শক্তি আরও বেড়ে যায়। তাই তিনি চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, ফরিদপুর এমনকি উত্তর ও পূর্ব কলিকাতা পর্যন্ত তার প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ বিস্তৃত এলাকার কেন্দ্রস্থলে অর্ধচন্দ্র শোভিত ইসলামী পতাকা উত্তোলন করে অসীম শক্তিমত্তা ও মনোবলের পরিচয় দেন।

বস্তুত সেকালের ইংরেজ শাসক ও হিন্দু জমিদার দু'টি প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে এমনভাবে দাঁড়াতে পারার নজির ইতিহাসে সত্যই দুর্লভ।

তিতুমীরের এ কৃতিত্বকে স্বীকার না করে বরং হিংসা প্রণোদিত হয়ে হিন্দু লেখকগণ নানাবিধ ব্যঙ্গ রচনা ও কবিতা লেখেন। যেমন–

"নারিকেল বেড়ের তিতুমীর বুজরকি করিল।
যত সব মিঞা মোল্লা বানায়ে বাঁশের কেল্লা,
ফিরিঙ্গি বাদশার সঙ্গে লড়াই জুরিল।
মরি হায়, হায়, হায় মরি, হায়রে হায়।'...

তিতুমীর মুসলমান ছিলেন বলে হিন্দু সম্প্রদায় তাকে কিছুতেই সহ্য

করতে পারতো না। হিন্দু জমিদাররা তাদের রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে তিতুমীরকে পছন্দ করতো না, সর্বদা তিতুমীরের পেছনে লেগে থাকতো। হিন্দু লেখক, কবি, সাহিত্যিকরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না। তারা তিতুমীরের সকল প্রকার মেধা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেচনা ও শিক্ষা দীক্ষাকে বেমালুম অস্বীকার ও উপেক্ষা করে তাদের কবিতায়, নিবন্ধে ও লেখনীতে তিতুমীরকে হেয় প্রতিপন্ন করে ছেড়েছে।

তাদের লেখা পড়ে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিতুমীর নামে লোকটি মানুষ নামের কলঙ্ক। তার কোনো গুন নেই, কোনো জ্ঞানবুদ্ধি নেই, সে ধর্মনিরপেক্ষ নয়, সে সাম্প্রদায়িক, সে রুক্ষ, নিষ্ঠুর ও একজন জল্লাদ।

ছোটো অপ্রতিষ্ঠিত লেখক থেকে শুরু করে হিন্দু বড় প্রতিষ্ঠিত লেখক পর্যন্ত এই সংকীর্ণমনা দোষে দুষ্ট। তিতুমীরের একটাই অপরাধ তিনি মুসলমান। তিনি যদি হিন্দু সমাজের কেউ হতেন, তাহলে তার মতো মানুষ–এ তল্লাটে কেন, সারা বিশ্বে হয়তো থাকতো না। হিন্দু সম্প্রদায় তাকে দেবতা মনে করে মাথায় নিয়ে নাচতো।

বলাবাহুল্য, তিতুমীর যে সময়ে ছিলেন তখনকার সময়ে একজন হিন্দুব্যক্তিও ছিলো না যার সঙ্গে তিতুমীরের তুলনা করা চলতো। অসাধারণ বীরত্ব, অসম সাহস, সূক্ষ্ম যুক্তি, ধর্মগত প্রাণ, অসাধারণ সংগঠন শক্তি এবং অনন্য দেশপ্রেম তিতুমীরকে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের চেয়েই বড় করে তোলেনি বরং ইতিহাসে একজন অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

কিন্তু হিন্দু লেখক, গবেষক, ইতিহাসবিদ ও সমালোচকগণ সেসব পথও বন্ধ করে দিতে প্রচেষ্টা চালায়। হিন্দু পণ্ডিতবর্গও এ ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে দূরে থাকতে পারে না। তারা তিতুমীরকে একজন নিচু শ্রেণীর হীনব্যক্তি হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত করতে পিছপা হয় না।

তিতুমীরের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায় তিতুমীরকে একজন সাম্প্রদায়িক ও নিচুস্তরের মানুষ হিসেবে

চিহ্নিত করে চলেছে, যেন সকল কাল সকল যুগের মানুষ জানতে পারে যে তিতুমীর নামের এক মুসলমান ব্যক্তি অতি নিকৃষ্ট ছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক, সাহিত্য আকাদেমির কর্মপরিষদের প্রাক্তন সদস্য এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., পি-এইচ.ডি. উচ্চ শিক্ষিত, গবেষক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক ও ইতিহাসবিদ তার 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' (খ্রীষ্টীয় দশম-বিংশ শতাব্দী) বইতে লিখেছেন–

'উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে চব্বিশ পরগণায় 'তিতু' নামে এক 'ধর্মান্ধ' মুসলমান সারাদেশে ইসলাম ধর্ম ও শাসন প্রচারের 'অভিপ্রায়ে' ইংরেজ শাসনের 'বিরুদ্ধে' 'অশিক্ষিত' কৃষক শ্রেণীর মুসলমানদের নারিকেল বেড়ে (যশোহর) গ্রামে এক 'অস্থায়ী' বাঁশের কেল্লার মধ্যে 'জড়ো' করে ইংরেজ কর্মচারী ও হিন্দু জমিদারদের ওপর 'অত্যাচার' করতে থাকে।

ইংরেজ শাসনের 'বিরুদ্ধে' তার আন্দোলন শীঘ্রই 'হিন্দু বিদ্বেষে' পরিণত হল। তিতুর 'চেলা-চামুন্ডারা' হিন্দু জমিদার ও উচ্চ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীকে মেরে ফেলল, চব্বিশ পরগনা, যশোহর, খুলনায় 'ত্রাসের' রাজত্ব চলতে লাগল।

হিন্দুদের ওপর 'অত্যাচারের মাত্রা' বেড়ে গেল। 'ধর্মান্তরীকরণ' ও 'নারীহরণ'ও চলল প্রচণ্ডভাবে। তখন বাধ্য হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সৈন্য পাঠিয়ে এই 'ধর্মান্ধ' 'ওয়াহবী' সম্প্রদায়ভুক্ত 'অশিক্ষিত' তিতুমীরকে গুলি করে মেরে ফেলল, তার বাঁশের কেল্লা ধুলিসাৎ হল, অনুচরেরা হয় মারা পড়ল, নয় ফাঁসি খেল, কেউ কেউ কালাপানির পরপারে দ্বীপান্তরে গেল।

তিতুমীরের 'আমীর' বনবার স্বপ্ন 'শোচনীয়ভাবে' ভেঙ্গে গেলে হিন্দুরা 'অত্যাচার' থেকে মুক্তি পেয়ে তিতু ও তার 'দলবলকে' 'ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ' করে অনেক ছড়া রচনা করেছিল। বলাবাহুল্য তাতে 'ধর্ম-বিদ্বেষ' থাকবেই, কারণ তিতুও 'ধর্মবিদ্বেষকে' 'মূলধন' করেছিল।

তার না ছিল 'শিক্ষা' না ছিল 'বুদ্ধি।' 'লাঠিয়াল' শ্রেনীর 'লোকটি' কলকাতার কাছেই যেরকম 'গোলমাল' সৃষ্টি করেছিল তাতে সে সুযোগে কোম্পানীর দুর্বল শাসন স্পষ্টই ধরা পড়েছে।

যাই হোক, সম্প্রতি যারা বাঁশের 'কেল্লাপতি' 'লাঠিয়াল' তিতুকে স্বদেশপ্রেমের 'উচ্চমঞ্চে' স্থাপন করে তাকে 'শহীদ' ইত্যাদি 'ভূষণে অলঙ্কৃত' করতে চান, তারা স্থানীয় প্রবাদ, কাহিনী ও তথ্য সম্বন্ধে 'সম্যক অবহিত' নন।'

আমরা বিস্মিত না হয়ে পারিনা যে, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত উচ্চশিক্ষিত একজন ব্যক্তি কি করে মুসলমান বিদ্বেষী হয়ে হিন্দুপক্ষ সমর্থন করে সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠতে পারেন। এবং একজন সৎ শিক্ষিত, ধর্মগত, মেধা ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিকে একজন অশিক্ষিত ও লাঠিয়াল হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত করতে প্রয়াস পান।

তিনি তিতুমীরের কথা বলতে গিয়ে যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন তা চিহ্নিত করা হলো। এ জন্যে যে, শিক্ষিত জনে অসিতকুমারের শিক্ষা, রুচি ও অসাম্প্রদায়িক বোধের কিছুটা পরিমাপ করতে সক্ষম হবেন।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবহৃত শব্দগুলো হচ্ছে--তিতু, ধর্মান্ধ, অভিপ্রায়, বিরুদ্ধে, অস্থায়ী, জড়ো, হিন্দু বিদ্বেষ, ত্রাসের, অত্যাচারের মাত্রা, ধর্মান্তরীকরণ, প্রচন্ডভাবে ওয়াহবী, অশিক্ষিত, কালাপানি, পরপারে, আমীর, বনবার, শোচনীয়ভাবে, অত্যাচার, দলবল, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, ধর্মবিদ্বেষ, মূলধন, শিক্ষা, বুদ্ধি, লাঠিয়াল, লোকটি, গোলমাল, কেল্লাপতি, উচ্চমঞ্চে, শহীদ, ভূষণে অলঙ্কৃত, সম্যক অবহিত ইত্যাদি।

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার প্রথম শহীদ তিতুমীর সম্পর্কে অসিত কুমার মহাশয়ের শব্দ প্রয়োগ খুবই দুঃখজনক ও লজ্জাকর। যারা বিদ্বান ও শিক্ষিত তাদের বিচার বুদ্ধি ও বিবেচনা সাধারণত হয়ে থাকে সার্বজনীন। সকল সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের জন্যে তাদের লেখা হয়ে ওঠে পথ নির্দেশ।

শিক্ষিত ও বোদ্ধাজনদের লেখায় সদা সত্য ভাষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে। এটাই সবার জানা।

কিন্তু অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাপীঠের শীর্ষস্থানে অবস্থান করে সত্যের অপলাপ করেছেন।

বলাবাহুল্য, এমনিভাবে হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের নানাদিক থেকেই পর্যুদস্ত করে চলেছে। আগে থেকেই হিন্দু লেখক, কবি, সমালোচক, প্রাবন্ধিক, গবেষক অর্থাৎ শিক্ষিত জনেরা মুসলমানদের নানাভাবে অপমান অপদস্ত করে চলেছে–মুসলমান অসামান্য ব্যক্তিত্বদের বিকৃতভাবে ইতিহাসে চিত্রিত করে চলেছে।

বিদেশী ইংরেজ ও প্রতিবেশী হিন্দুদের এহেন বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তিতুমীর, স্বাধীনতা, ধর্মসংস্কার এবং আর্থিক মুক্তি অভিযানে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

পরবর্তীকালে ইসলাম প্রচারক হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন তিতুমীরের মুক্তি আন্দোলনেরই অংশ বিশেষ বলা যেতে পারে।

তিতুমীরের প্রসঙ্গে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আরও একটি অধ্যায় তুলে ধরা যেতে পারে।

সতের

তা ছিল ফকির বিদ্রোহের কথা। এ ফকিরগণ এদেশী জমিদার এবং বিদেশীদের শাসন থেকে প্রথম প্রথম প্রজাদের উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। ক্রমে ক্রমে তাদের মুরীদদের দলভারী হয়ে ওঠে। সেসব ১৭৭৫ সালের কথা। দেখতে দেখতে মুসলমান ফকির ও অমুসলমান সন্ন্যাসীদের মিলিয়ে এক বিরাট দলের সৃষ্টি হয়। এঁদের নেতা ছিলেন মজনু ফকির। আসল নাম মজনু শাহ।

তিনি বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে এক দুর্গ নির্মাণ করেন।

মজনু শাহের সাথে পূর্নিয়ায় ১৭৮১ সালে ইংরেজদের প্রথম সংঘর্ষ বাধে। মজনু শাহের তিন শতাধিক শিষ্যের কাছে ইংরেজ সৈন্য হেরে যায়।

এরপর ১৭৮৩ সালে মজনু শাহ ময়মনসিংহের জাফর শাহী পরগনায় গিয়ে ভীষণ তাসের সৃষ্টি করেন। এতে ইংরেজগণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং মজনু শাহকে দমন করার উদ্দেশ্যে এক বিরাট বাহিনী গঠন করে।

১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেফটেন্যান্ট ব্রেজানের সাথে মজনু শাহের বাহিনীর এক বিরাট যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে সশস্ত্র ইংরেজ বাহিনীর কাছে মজনু শাহের পরাজয় ঘটে এবং তিনি নিহত হন।

দেশের মুক্তি এবং মানুষের মঙ্গলার্থে যারা জীবন বিসর্জন দেন, তাদের যদি শহীদ বলা হয়–তাহলে মজনু শাহও ছিলেন এদেশের একজন শহীদ।

সত্যিকারভাবে বলতে গেলে ইংরেজ রাজ্যের এক অংশ তখন এ ফকিরদের দখলে চলে গিয়েছিল। এদেশের স্বার্থবাদী হিন্দু জমিদার ও

হিন্দু নাগরিকদের সাহায্যে তা আবার ইংরেজদের দখলে চলে যায় এবং এ অঞ্চল আবার ইংরেজদের পদানত হয়।

তিতুমীর ছিলেন তরীকায়ে মুহম্মদীয়ার অনুসারী হানফী মযহার এবং সুন্নীমতের খাঁটি মুসলমান। এ মতের আদিপথ প্রদর্শক ছিলেন দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ আলেম শাহ অলিউল্লাহ।

অপর পক্ষে হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী মতের অনুসারীরা ছিলেন নজদের মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের প্রদর্শিত পথের অনুগামী।

এ হিসেবে তিতুমীর এবং হাজী শরীয়তুল্লাহর মধ্যে ধর্মগত কিছু কিছু পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। তিতুমীরের ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল দিল্লীতে আর শরীয়তুল্লাহর ছিল আরবে।

এ উভয় দল যদিও হানাফী ময্হারেই অনুগামী ছিলেন, তবুও জুমা এবং ঈদের নামাজ সম্বন্ধে ছিল ঘোর মত বিরোধী। ফরায়েজীদের মতে ব্রিটিশ শাসনাধীনে এদেশে ঐ নামাজ পড়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

ধর্ম সংক্রান্ত এসব মতানৈক্য সত্ত্বেও তিতুমীর এবং হাজী শরীয়তুল্লাহর মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। হাজী শরীয়তুল্লাহর পুত্র দুদু মিয়া যখন বারো বছর বয়সে মক্কা শরীফে পবিত্র হজ্ব পালন করতে যান, তখন পথে তিতুমীরের সাথে দেখা করে তার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করেন। এ দু'দলের ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে আরো একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

যশোরের মুন্সী ফরিদুদ্দীন নামে এক ব্যক্তি কলিকাতা গিয়ে তিতুমীরের মুরীদ হন। এর কিছুকাল পরে তিনি ফরিদপুর আসেন এবং সেখানে ফরায়েজী দলের একজন মেয়েকে বিয়ে করেন। মুনসী ফরীদুদ্দীন হাজী দুদুমিয়ার উকিল এবং পরে তার ছেলেরও অভিভাবক নিযুক্ত হন। এতদসত্ত্বেও তিনি ফরায়েজী মত গ্রহণ না করে আমরণ তিতুমীরের তরীকা মুহম্মদীয়ার অনুগামীই ছিলেন।

আরো একটি ব্যাপারেও এ দু'নেতার মধ্যে ছিল বিশেষ মিল। যেমন তিতুমীর, তেমনি হাজী শরীয়তুল্লাহ উভয়েরই জন্ম হয়েছিল অতি সাধারণ ঘরে। আর এরা লালিত পালিত হয়েছিলেন অতি সাধারণ পরিবারে।

আবার উভয়েরই বিদ্রোহ চলেছিল ওইসব জেলায়, যেসব জায়গায় হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারে চাষী ও নিম্নশ্রেণীর মুসলমানরা নিপীড়িত এবং নিষ্পেষিত হচ্ছিল।

মুসলমান চাষীদের পক্ষ সমর্থন করে তিতুমীর যেমন হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে সামাজিক, ধর্মীয় ও আর্থিক সংগ্রাম শুরু করেছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহর সংগ্রামও ছিল তদনুরূপ ঢাকা ও ফরিদপুরের জমিদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতক জুড়ে সারা মুসলিম দুনিয়ায় অবিরামভাবে চলছিল একই প্রশ্ন ও একই সংগ্রাম। সে সংগ্রাম ছিল ইসলামের সংস্কার এবং বিদেশী শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করা। মানুষের মঙ্গলার্থে যারা এ সংগ্রাম চালিয়ে শহীদ হয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন–

মজনু শাহ, শহীদ তিতুমীর, সৈয়দ আহমদ, শহীদ ইসমাইল, সুদানের ইমাম মেহেদী, মিসরের জগলুল এবং আফগানের জামালুদ্দীন।

এ মুজাদ্দেদ, মুজাহিদ এবং শহীদানের চিন্তা ও সংগ্রাম দেশ, কাল ও যুগের ব্যবধানকে ছাড়িয়ে একই স্থানে মিশে গেছে। চিরযুগে এরা নিপীড়িত মানুষের সাহায্যে এসে দাঁড়াবেন। এঁরা অমর আপন শক্তিমত্তায় চিরজীবন্ত ও চির জাগ্রত–তব ও তাবে জবিদানা।

শহীদ তিতুমীর ছিলেন দিল্লীর আলেমদের মুরীদ ও অনুগামী। সৈয়দ আহমদ ছিলেন তার সাক্ষাৎ পীর ও মুরশিদ। সে হিসেবে সৈয়দ আহমদ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

সৈয়দ আহমদ পাঞ্জাবের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ১৮২৬ সালে যে জেহাদ ঘোষণা করেন, সে জেহাদের কারণগুলো ছিল এরূপ–

পাঞ্জাবের শিখ শাসনাধীনে যখন মুসলমানদের নামাজ, রোজা, কুরবানী প্রভৃতি ধর্মীয় কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় আর মুসলমানগণ অকথ্য অত্যাচারে নির্যাতিত হতে থাকে, তখন তারা গিয়ে দিল্লীর মহান আলেম হজরত আবদুল কাদেরের কাছে নিজেদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে। হজরত মুসলমানদের এ মর্মান্তিক দুর্দশার কথা শুনে

সৈয়দ আহমদকে ডেকে পাঠান। সৈয়দ আহমদ এলে তাকে তিনি ব্যথিতচিত্তে বলেন–

'সৈয়দ সাহেব, আমি এখন বার্ধক্যে পৌছেছি। মুসলমানদের দুর্দশার কথা শুনে আমি মর্মাহত কিন্তু আমি এখন শক্তিহীন। তাই আপনার উপর ভার দিলাম–আপনি সব মুরীদদের নিয়ে কাফেরদের মোকাবিলা করুন।'

সৈয়দ সাহেব পীরের আদেশ পেয়ে আপন সাথী ও মুরীদদের উদ্দেশে বললেন–

'এখন যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য–সব কাফেলার অগ্রসর হওয়া উচিত।'

এরপর শিখেদের সাথে জেহাদ করতে করতে সৈয়দ সাহেব বালাকোটে শহীদ হন।

সৈয়দ আহমদের বিশিষ্ট মুরীদ ছিলেন বাংলার তিতুমীর। তাই পাঞ্জাবের সে ভয়াবহ জেহাদে তিতুমীরও সৈন্য সাহায্য করেছেন বলে অনেকের ধারণা। এমনকি সীমান্তের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলমানগণ স্বজাতীয় প্রীতি ও ধর্মীয় আকর্ষণে সৈন্য ও রসদ সরবরাহ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে এ জাগরণের মূলে ছিল শহীদ তিতুমীরের প্রেরণা ও সংগঠনী শিক্ষা।

মুসলমান জাতি ছিল সদ্য–রাজ্যহারা, দিশেহারা ও বিভ্রান্ত। ব্রিটিশ শাসনকে তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। তাদের পক্ষে ব্রিটিশকে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। কেননা, ব্রিটিশরা তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে।

অন্যদিকে হিন্দু জাতিও ছিল রাজ্যহারা। কিন্তু তাদের পরে ছিল মুসলমান। মুসলমানদের পরে ইংরেজ। সুতরাং ইংরেজদের প্রভূ বলে স্বীকার করে নিতে হিন্দুদের পক্ষে যতখানি সহজ ছিল, মুসলমানদের পক্ষে তত সহজ ছিল না।

তা ছাড়া হিন্দুজাতি ও মুসলমান জাতি এই দুই জাতির মধ্যে চরিত্রগত যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। মুসলমানগণ উদার ও স্বাধীনচেতা। তাদের আত্মসম্মানবোধ প্রখর। তারা একমাত্র আল্লাহ সর্বশক্তিমানের কাছে মাথা

নত করা ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথা নত করতে নারাজ। এটা মুসলমানের কৃষ্টি বা সংস্কৃতি নয়। এটা তাদের ধর্মীয় শিক্ষা।

সুতরাং মুসলমান জাতি ভাংবে তবু মচকাবে না। অর্থাৎ তারা আপস করতে রাজি নয়। মাথা নোয়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয় তা সে ইংরেজ প্রভুই হোক।

অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায় চারিত্রগতভাবে নতজানু স্বভাবের। স্বার্থ সিদ্ধিতে তারা যে কারোর কাছে মাথা নত করতে এমনকি নিজেকে বিকিয়ে দিতে কোনোরূপ দ্বিধা করে না।

এরই ফলে জীবন যুদ্ধে হিন্দুরা ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজদের অতি কাছাকাছি ও তাদের আপনজন হিসেবে স্থান করে নিতে পারলো আর মুসলমানরা বহু দূর পেছনে পড়ে রইলো। আর হিন্দুদের স্বভাব-চরিত্রে ও নতজানু নীতিতে তারা লেখাপড়া, চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বহুদূর এগিয়ে গেল।

অপরপক্ষে মুসলমান জাতি ক্রমান্বয়ে ইংরেজ শাসকদের রোষানলে পড়তে লাগলো।

মুসলমানগণের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল চাষী। কৃষি কাজ করাই ছিল তাদের মুখ্য পেশা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান চাষীরা চিরদিনের জন্য ইংরেজ ও হিন্দু ভূম্যাধিকারীদের অধীনে অসহায়ভাবে ক্রীতদাসের শামিল হয়ে পড়লো।

শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সরকারী চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়ে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান অসহায়ভাবে অবনতির নিম্ন থেকে নিম্নস্তরে গিয়ে পৌছালো।

এ হতভাগ্য মুসলমানদের বাঁচাবার সংকল্প নিয়েই পূর্ববঙ্গে পীর শরীয়তুল্লাহ এবং উত্তরবঙ্গে হজরত নিসার আলী তিতুমীর এসে দেখা দিলেন।

আঠার

সর্বনাশা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি ছিল যে বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ ধ্বংসের পথে চলে গেল, সেটা জানা দরকার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হচ্ছে রাজস্ব শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজ কোম্পানী মুঘলদের রীতিনীতি অনুসরণ করে। মুঘল বাদশাহদের আমলে প্রজাদের কাছ থেকে সরাসরি রাজস্ব আদায় করা হতো। মুঘল সরকারের দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে এ পদ্ধতির কিছুটা অবনতি ঘটে; কিন্তু এর প্রধান বৈশিষ্টগুলো ঠিকই ছিল।

ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে কোনো ধারণা না থাকায় রাজস্ব ব্যবস্থার ব্যাপারে তাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এজন্য তারা রাজস্ব ইজারাদারদের কাছে রাজস্ব নিলাম করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। এ রাজস্ব-ইজারাদাররা জমিদার নামে পরিচিত। কিছু কিছু পুরনো পরিবার ছিল, যারা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শাসক ছিল এবং রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করতো। প্রথমে জমিদারদের পাঁচ বছরের জন্য রাজস্ব আদায় করার অধিকার দেওয়া হয়। পরে যে সবচেয়ে বেশি দরে নিলাম ডাকতে পারতো তার বার্ষিক বন্দোবস্ত ঠিক হতো।

ইংরেজ সরকার ও জমিদার উভয়ের জন্য এ পদ্ধতি অসুবিধাজনক ছিল।

জমিদাররা অনেক সময় রাজস্বের নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে পারতো না। কারণ উচ্চহারে নিলাম ক্রয়ের ফলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে, কোম্পানীর আয়ের কোন নিশ্চয়তা না থাকায় ব্যয়ের পরিমাণও তারা স্থির করতে পারতো না। ফলে বাজেট তৈয়ার করা অসম্ভব

হয়ে পড়ে।

এ অসুবিধার অবসানকল্পে লর্ড কর্নওয়ালিশ জমিদারদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য রাজস্ব বন্দোবস্ত করে (১৭৯০)। এবং পরে তা (১৭৯৩ খ্রীঃ) 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে' পরিণত হয়।

কর্নওয়ালিশ দু'টি কারণে জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করতে প্রণোদিত হয়। প্রথমত–কোম্পানীর আয়ের নিশ্চয়তা বিধান। দ্বিতীয়–ইংরেজদের স্বার্থের অনুকূলে জমিদার শ্রেণীর সমর্থন লাভ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের চিরস্থায়ী মালিকানা স্বীকৃত হলো। ইংরেজ সরকারের রাজস্বেরও নিশ্চিত ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু প্রজাদের কোনো সুবিধা হলো না। তারা জমিদারদের অত্যাচারের শিকারে পরিণত হলো। বঙ্গদেশের চাষীরা ছিল অধিকাংশ মুসলমান, আর জমিদার ছিল হিন্দু।

ফরায়েজী আন্দোলন বিভিন্ন খলিফাদের অধীনে বিস্তৃতি লাভ করেছিল প্রায় সারা বাংলায়। হিন্দু ও ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে এ ছিল এক বিরাট জাগরণ।

সৈয়দ আহমদের আন্দোলন ছিল সারা ভারতব্যাপী। হাজী শরীয়তুল্লাহর ছিল পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলায়। আর তিতুমীরের ছিল উত্তরবঙ্গ, নদীয়া ও ফরিদপুরের কিছু অংশে।

এ তিনটি আন্দোলনের সারকথা ছিল–ইসলাম ধর্মের বিপ্লবী সংস্কার।

উদ্দেশ্যপূর্ণ ও সাম্প্রদায়িক লেখার বেড়াজাল ছিন্ন করে সত্য যেমন প্রকাশ পায় তেমনি বাংলার স্বাধীনতার প্রথম শহীদ তিতুমীরের সত্য কাহিনী বাংলার জন্যে আত্মনিবেদন ও ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠার কথা ইতিহাসের পাতায় জ্বল জ্বল করবে। কাল থেকে কালান্তর ও যুগ থেকে যুগান্তরের মানুষ সেই সত্য কথা পড়ে, হৃদয়ঙ্গম করে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হয়ে ওঠবে।

কালে কালে যুগে যুগে তিতুমীরের মত দেশপ্রেমিক ও ধার্মিক গড়ে ওঠবে–যারা তিতুমীরের মত হাসিমুখে দেশ মাতৃকার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেবে। তিতুমীর হয়ে ওঠবে সকলের কাছে একটি আদর্শ।